পঞ্চতন্ত্র

গল্পসংগ্রহ

পুনর্কথন : বিপ্রদাশ বড়ুয়া

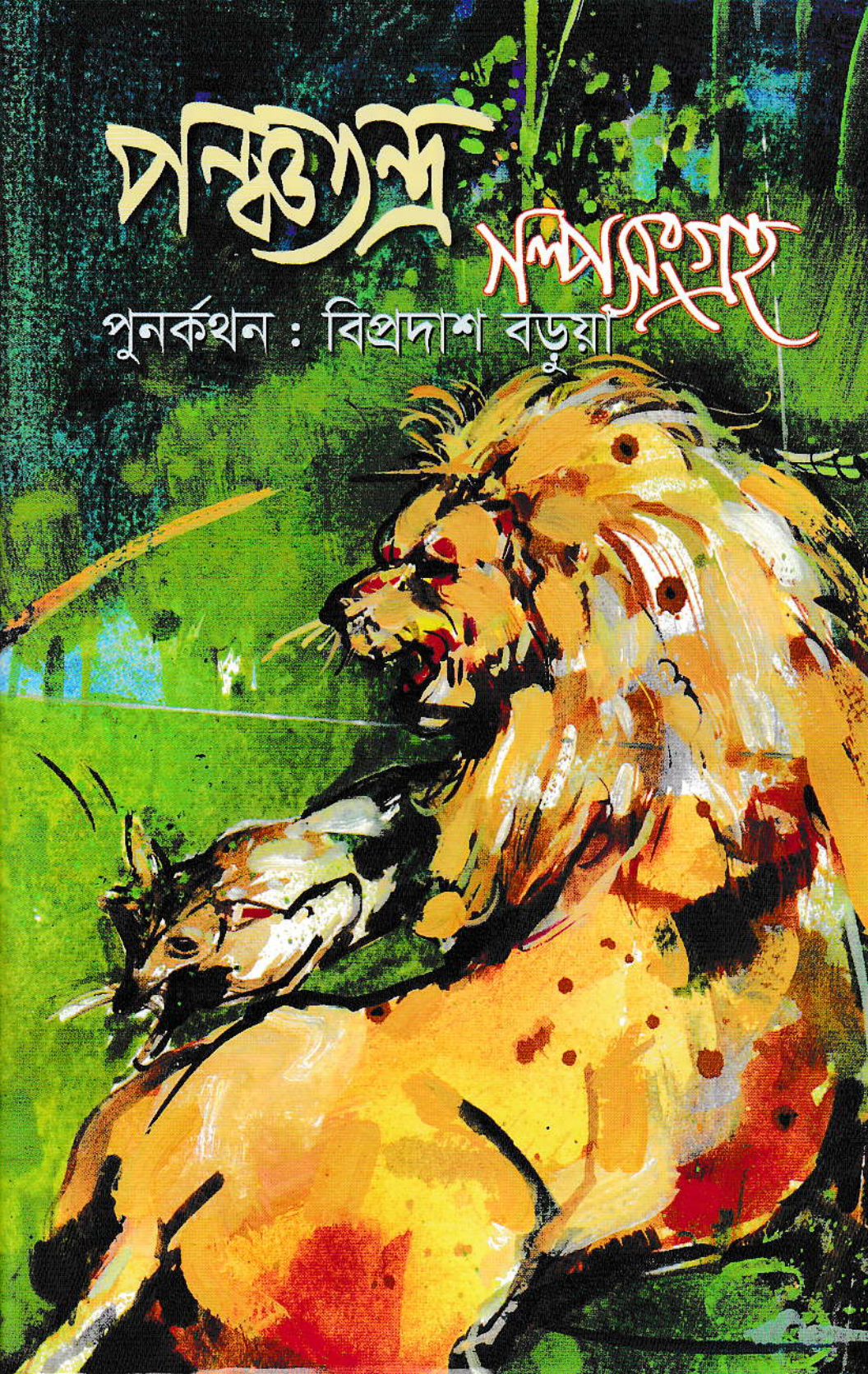

পঞ্চতন্ত্র
গল্পসংগ্রহ

পুনর্কথন : বিপ্রদাশ বড়ুয়া

সচিত্রকরণ : রণজিৎ দাস

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন : রণজিৎ দাস
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : কার্তিক ১৪১৫, নভেম্বর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৮, ফেব্রুয়ারি ২০০২
ISBN 984-465-282-0

মূল্য : দুইশ' টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

আতোয়ার রহমান
লায়লা রহমান
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচিপত্র

পঞ্চতন্ত্র প্রবেশিকা		৯
মিত্রভেদ		
	দমন ও সঞ্জীব	১৫
	দতিল ও গোরভ	২৬
	কাক, কেউটে ও সোনার হার	২৯
	বক ও কাঁকড়া	৩১
	শেয়াল, চিতা ও কাকের প্রভুভক্তি	৩৫
	সিংহ, শেয়াল, নেকড়ে ও উট	৩৯
	পঞ্চতন্ত্রের বচন	৪২
মিত্রপ্রাপ্তি		
	লঘুপতন ও তার বন্ধুরা	৪৫
	সোমিলের ভাগ্য নির্বাচন	৫৯
	পঞ্চতন্ত্রের বচন	৬৫
কাকলূকীয়		
	চড়ুই, খরগোশ ও বেড়াল	৬৯
	হরিদত্ত ও ক্ষেতের সাপ	৭৩
লব্ধনাশ		
	কুমোরের যুদ্ধযাত্রা	৭৭
	শেয়াল-শাবক ও সিংহ-শাবক	৮০
	কুকুর চিত্রগা	৮২
	পঞ্চতন্ত্রের বচন	৮৪
অপরীক্ষিত-কারক		
	চার যুবক ও সিদ্ধপ্রদীপ	৮৭
	চার বন্ধু ও মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা	৯১
	চার পণ্ডিতমূর্খ	৯৪
	গর্দভ-সঙ্গীত	৯৮
	তাঁতি মন্থর	১০১
	রাজকন্যা, রাক্ষস ও চোর	১০৪
	দু' মুখো ভারণ্ড	১০৭
	পঞ্চতন্ত্রের বচন	১০৮

পঞ্চতন্ত্র প্রবেশিকা

পশুপাখির মধ্যে মানুষের আচার-ব্যবহার আরোপ করে প্রাচীন ভারতে এক ধরনের গল্প রচিত হয়েছিল। এর প্রথম নমুনা পাওয়া যায় পালি জাতক-সাহিত্যে।

পঞ্চতন্ত্র পহ্লবী ভাষায় অধুনালুপ্ত রূপটি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে উদ্ভূত হয়েছিল। সুতরাং মূল পঞ্চতন্ত্র এর কিছুকাল আগে রচিত। এর রচয়িতার নাম জানা যায় না। 'পঞ্চতন্ত্র কথামুখম্'-এ এর প্রণেতা হিসেবে বিষ্ণুশর্মার নাম পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকের মতে এই নামটি কাল্পনিক। তবুও বিষ্ণুশর্মার নামেই পঞ্চতন্ত্র আজ পর্যন্ত প্রচলিত। পঞ্চতন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের মাধ্যমে ইউরোপের ফেব্‌ল সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে। ঈশপ্‌স ফেব্‌লও জাতকের পরে রচিত। পঞ্চতন্ত্রের কাশ্মীর দেশে প্রচলিত রূপটির নাম 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। এই পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনতম সংস্কৃত রূপ বলে মনে করা হয়। বাংলা দেশের রূপটির নাম 'হিতোপদেশ'।

'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্' থেকে জানা যায় যে সুকুমারমতি রাজপুত্রদের চিত্তাকর্ষকভাবে নীতিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের ৫টি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, যথা মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধি-বিগ্রহ বা কাকলূকীয়, লব্ধনাশ ও অপরীক্ষিতকারিত্ব। প্রসঙ্গগুলোর প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও একটি কাঠামোর অন্তর্গত। প্রতিটি প্রসঙ্গে অনেক ছোট ছোট গল্প একটি প্রধান গল্পের সঙ্গে যুক্ত। গল্পগুলো গদ্যে রচিত হলেও মাঝে মাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক আছে।

মূল পঞ্চতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে এর অন্য কয়েকটি রূপ রয়েছে। এই রূপগুলোকে চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়।

১. পারস্যের পহ্লবী ভাষায় অধুনালুপ্ত রূপটি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে উদ্ভূত হয়েছিল।
২. পহ্লবী ভাষার মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো ইউরোপের ফেব্‌ল সাহিত্য গড়ে তোলে।
৩. কাশ্মীরী রূপটির নাম 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। এটি প্রাচীনতম সংস্কৃত রূপ।
৪. বাংলা দেশের বা (বাংলা ভাষার) রূপটির নাম 'হিতোপদেশ'।

বিষ্ণুশর্মা কেন পঞ্চতন্ত্র রচনা করলেন এবার সে কথায় আসা যাক। অনেক দিন আগে দক্ষিণ দেশে মহিলারোপ্য নামে একটি নগর ছিল। তার রাজার নাম অমরশক্তি। তিনি ছিলেন খুব প্রজাবৎসল। প্রজাদের তিনি খুব ভালোবাসতেন, প্রজারা তাঁকে খুব ভালোবাসত।

জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধন-দৌলতে রাজা ছিলেন খ্যাতিমান। কখনো কোনো প্রার্থী রাজার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরত না।

রাজার ছিল তিন পুত্র–বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও বহুশক্তি। কিন্তু তিনজনেই ছিল গবেট। লেখাপড়ার ধারে-কাছে তারা ছিল না। খেলাধুলো, দুষ্টুমি আর খাওয়া নিয়েই তারা ছিল সন্তুষ্ট। এই মূর্খ অপদার্থ ছেলেদের নিয়ে রাজার যত চিন্তা ও অশান্তি।

কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। একদিন রাজপুত্রদের হতে হবে রাজা, রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন করতে হবে। রাজা অমরশক্তি মহা চিন্তায় পড়লেন।

শেষে একদিন তিনি মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, দেখুন, রাজকুমারদের বয়স বাড়ছে কিন্তু লেখাপড়ায় তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না। এরা যাতে নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন। পাঁচ শো পণ্ডিত রাজ্য থেকে মাসোহারা পায়, আর রাজকুমারেরা থাকবে কি না গণ্ডমূর্খ! অন্তত একজন পণ্ডিতও যদি রাজকুমারদের দায়িত্ব নিত নিশ্চিন্ত হতাম।

একথায় মন্ত্রীদের টনক নড়ল। তখন মন্ত্রীরা ভাবলেন, সত্যিই তো! রাজকুমারদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়া দরকার। অল্প সময়ে সবরকম বিদ্যায় তাদের কুশলী হয়ে উঠতে হবে। তাদের বয়স হয়ে গেছে, আবার লেখাপড়ায়ও মতি নেই। কী করা যায়!

তখন খোঁজ পড়ল রাজ্যের সবচেয়ে বিদ্বান ও বয়স্ক পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার। তিনি ব্রাহ্মণ, সমস্ত বিদ্যা তাঁর অবগত। ছাত্র মহলে তাঁর খুব নামডাক।

রাজা তাঁকে ডাকলেন। সবিনয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাই, আমার মূর্খ ছেলেরা যাতে অল্প সময়ে সবরকম বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে, দয়া করে সেই ব্যবস্থা করুন। নইলে যে আমার রাজ্য রক্ষা হবে না। আমি আপনাকে এক শো গ্রাম দক্ষিণা দেব।

তখন বিষ্ণুশর্মা বললেন, মহারাজ, আমি বিদ্যা দান করি। আমি বিদ্যা বিক্রি করি না। আমার বয়স আশি বছর। ধন-সম্পত্তির লোভ আমার নেই। তবে আপনার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কুমারদের শিক্ষার ভার আমি নেব। আজ থেকে মাত্র ছ' মাসের মধ্যে আমি তাদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

ব্রাহ্মণের এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রাজা ও মন্ত্রীরা অবাক! আবার খুব খুশিও হলেন।

তিন কুমারকে নিয়ে বিষ্ণুশর্মা তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন। এসে তাঁর দীর্ঘ আশি বছরের বিদ্যা উজাড় করে লিখলেন পাঁচটি বড় গল্প। প্রত্যেকটি গল্প আবার অনেকগুলো গল্পের সমাহার। (পরবর্তীকালে রচিত 'আরব্য রজনী'ও এরকম অনেকগুলো গল্পের সমাহার)। প্রতিটি গল্পের ভাঁজে ভাঁজে গেঁথে দিলেন সমস্ত বিদ্যার সার কথা। অনেক শ্লোক, অনেক উপদেশ ও নীতিকথা।

এই পাঁচটি গল্পে পাঁচ ভাগে লেখা পুঁথির নাম দিলেন পঞ্চতন্ত্র। প্রতিটি তন্ত্র বা ভাগের নাম হল—মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধি-বিগ্রহ বা কাকলূকীয়, লব্ধনাশ ও অপরীক্ষিতকারিত্ব।

রচনা শেষ করে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তিন রাজকুমারকে গল্প বলা শুরু করলেন। তাঁর ছাত্ররা তো পড়তে চায় না, তাই গল্প বলে তাদের বোঝাতে লাগলেন দেশ, মানুষ, লোকাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পশু-পাখি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার কী হওয়া উচিত এবং কী অনুচিত। তাঁর ছাত্ররাও গল্পে মজে গেল, পড়াশুনোয় ডুবে

গেল। খেলা, দুষ্টুমি, আড্ডা ভুলে গেল। এমনকি নাওয়া-খাওয়াও ভুলে গেল। গুরু তাদের হাতে ধরে শেখান, খাওয়ান সময়মতো, ঘুমোতে দেন প্রয়োজন অনুযায়ী।

তিন রাজকুমার ছ' মাসের মধ্যে গুরু বিষ্ণুশর্মা যেমনটি চেয়েছিলেন তেমন হয়ে উঠলো। সব শাস্ত্র তাদের আয়ত্তে এসে গেল। তারপর কথামতো ঠিক সময়ে তাদের নিয়ে রাজদরবারে গিয়ে তিনি উপস্থিত।

রাজা অমরশক্তি নম্র, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বিদ্যায় পারদর্শী কুমারদের দেখে মুগ্ধ। তিনি দেখেই বুঝতে পারলেন কুমারেরা আগের কুমার নেই, তিনি তাদের বুকে টেনে নিলেন। সেই থেকে বিদ্যার সার হিসাবে পঞ্চতন্ত্র পৃথিবীবিখ্যাত হিসাবে পরিচিত।

জাতকের কাহিনীর প্রভাব পড়েছে পঞ্চতন্ত্রে। 'রুহক-জাতক' (১৯১ সংখ্যক জাতক)-এর অনুরূপ পঞ্চতন্ত্রের লব্ধনাশের ৬ সংখ্যক কাহিনীতে দেখা যায় নন্দ তার স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে নিজের পিঠে উঠতে দিয়েছিল, এবং নন্দের সচিব বররুচিও স্ত্রীর আদেশে নিজের মাথা ন্যাড়া করিয়ে ছিল। আবার 'চুল্লপদ্ম-জাতক' (১৯৩)-এর অনুরূপ লব্ধনাশের ৫ সংখ্যক কাহিনীতে দেখা যায় স্বামী নিজের অর্ধেক আয়ু দিয়ে পত্নীকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু সেই পত্নীই শেষে অন্যের কাছে পালিয়ে যায়। আবার 'কূট বাণিজ-জাতক' (২১৮)-এর অনুরূপ গল্প আছে পঞ্চতন্ত্রে। তাতে কূটবণিকের পরিবর্তে এক শ্রেষ্ঠী, সাধুবণিকের পরিবর্তে জীর্ণধন নামক এক বীণকপুত্র এবং লাঙলের ফালের বদলে দাঁড়িপাল্লা দেখা যায়। অন্যদিকে 'উলূক-জাতকে' (২৭০) কাক ও পেঁচার স্বাভাবিক বৈরিতার কাহিনী কাকোলূকীয় তন্ত্রের 'স্থিরজীবী ও অরিমর্দনের' গল্পের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। এভাবে মিল আছে 'বেণুক জাতক' (৪৩) ও 'ইন্দ্রসমানগোত্র-জাতক' (১৬১)-দুটি সঙ্গে 'হরিদত্ত ও ক্ষেতের দেবতা' গল্প, 'কুন্টনি-জাতক' (৩৪৩)-এর সঙ্গে 'কাক, কেউটে ও সোনার হার' গল্প, 'সন্ধিভেদ-জাতক (৩৪৯)-এর সঙ্গে 'দমন ও সঞ্জীব' গল্প, 'দর্ভপুষ্প-জাতক' (৪০০)-এর সঙ্গে 'চড়ুই, খরগোশ ও বেড়াল' গল্পের।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পের প্রসঙ্গে জাতকের কথা বলার কারণ কাহিনীর সাযুজ্যতা। পঞ্চতন্ত্রের বেশ কিছু কাহিনীতে জাতকের কাহিনীর প্রভাব সরাসরি বিদ্যমান। পঞ্চতন্ত্রের একটি অতি পরিচিত গল্প হল 'বাঘের চামড়া পরা গাধা'। এখানে গাধার মালিক ধোপা দিনভর গাধাকে খাটিয়ে রাতে বাঘের চামড়া পরিয়ে চাষীদের ক্ষেতে ছেড়ে দিত। এক রাতে গাধা এক মাদী গাধার ডাক শুনে নিজেও চিৎকার করে ওঠে। চাষীরা তখন চিনতে পারে যে গাধাটি আসলে বাঘের চামড়া পরা বর্ণচোরা। 'সিংহচর্ম-জাতকে' (১৮৯) দেখা যায় গাধাটি ছিল সিংহের চামড়ায় আবৃত। বাকি কাহিনী হুবহু এক রকম। পঞ্চতন্ত্রের 'রক্তমুখ ও করালমুখ' কাহিনীটি 'বানরেন্দ্র-জাতক' (৫৭), 'শিশুমার জাতক' (২০৮) ও 'বানর-জাতক' (৩৪২) কাহিনীর সঙ্গে গভীর মিল আছে। 'লঘুপতন ও তার বন্ধুরা' কাহিনীর হিরণমুখ মূষিকের ধনপ্রাপ্তির কথার সঙ্গে 'গ্রামণীচণ্ড-জাতক' (২৫৭) কাহিনীর সঙ্গে গভীর সাযুজ্য। এছাড়া এই কাহিনীর জালে পরা কপোতের কাহিনীর সঙ্গে 'সম্মোদমান-জাতকে'র (৩৩) কাহিনীর গভীরে মিল রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের 'রাজা ও বানর' কাহিনীটি জাতকের 'মশক-জাতক' (৪৪) ও 'রোহিণী-জাতক' (৪৫)-এর হুবহু মিল আছে।

এছাড়া 'ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি' কাহিনীর সঙ্গে 'কূট-বাণিজ-জাতক' (৯৮), 'সমুদ্র ও তিতির পাখি'র সঙ্গে 'কাক-জাতক' (১৪৬), 'রাজাচন্দ্র ও বানরদলপতি'র সঙ্গে জলপান-জাতক' (২০) ও কপি-জাতক' (৪০৪), 'চারবন্ধু ও মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা'র সঙ্গে 'সঞ্জীব-জাতক' (১৫০), 'চার

ব্রাহ্মণ যুবক ও বিদ্ধপ্রদীপ'-কাহিনীর সঙ্গে 'জরুদপান-জাতক' (২৫৬), 'ব্যাধ ও কপোত-কপোতী' কাহিনীর সঙ্গে 'সম্মোদমান-জাতক' (৩৩), 'দুই হাঁস ও কচ্ছপ' কাহিনীর সঙ্গে 'কচ্ছপ-জাতক' (২১৫), 'চড়ুইনি ও হাতি' গল্পের সঙ্গে লটুকিক-জাতক' (৩৫৭), 'বানর ও চড়ুই' গল্পের সঙ্গে 'কুচি-দূষক-জাতক' (৩২১), 'ব্রহ্মদত্ত, কাঁকড়া ও সাপ' গল্পের সঙ্গে 'সুবর্ণ কর্কট-জাতক' (৩৮৯), 'বক ও কাঁকড়া' গল্পের সঙ্গে 'বক-জাতক' (৩৮)-এর গভীর মিল আছে।

এত মিল থাকার পরও পঞ্চতন্ত্র আজ পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকহিত গল্প হিসাবে পরিচিত। আবার পঞ্চতন্ত্রের গল্পের গভীর প্রভাব দেখা যায় বাংলার লোককাহিনী ও লোকগল্পে। এর কারণ মানুষ গল্প পড়তে ও শুনতে ভালোবাসে। আবার গল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকা উপদেশ, নীতি-কথা, রহস্য ও হেঁয়ালি মানুষ যুগ যুগ ধরে শুনে ও পড়ে আসছে। এই সঙ্কলনও এজন্য পাঠকদের হাতে তুলে ধরা হল।

ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার **বিধদাশ বড়ুয়া**
ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৪০৮

মিত্রভেদ

মিত্রভেদ অর্থ হল বন্ধুত্ব ভাঙা বা নষ্ট করা। বন্ধুতে বন্ধুতে বিভেদ তৈরি করে দেবার কৌশল একটি নীতি বা বিদ্যার অংশ। এই নীতির নাম হল লোকব্যবহার বা রাজনীতি। এটিও শিক্ষার বিষয়। দুই রাজার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। পার্শ্ববর্তী আর এক রাজা চায় এই দুই রাজার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। পার্শ্ববর্তী আর এক রাজা চায় এই দুই রাজার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারলে সে একটি রাজ্য দখল করতে পারছে না। শেষে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব নষ্ট করে তবেই তৃতীয় রাজা জয়ী ও লাভবান হল।

এখানে কাক, কেউটে ও সোনার হার গল্পে কাক ও কাকিনীর শত্রু কেউটেকে পরাস্ত করতে বুদ্ধির আশ্রয় নিল। কাকিনী রাজকন্যার সোনার হার চুরি করে কেউটের গর্তে ফেলে দিল। আর রাজার প্রহরীরা এসে হার উদ্ধার করতে গিয়ে কেউটেকে শেষ করে দিলো। শেয়ালির বন্ধুত্ব লাভ করে কাক ও কাকিনী এভাবে শত্রুতা উদ্ধার করে বিপদ মুক্ত হল।

মিত্রভেদের 'দমন ও সঞ্জীব' গল্পে এই চাতুর্য আরো প্রকট। এক শেয়াল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কৌশলে প্রথমে পিঙ্গল নামে পশুরাজ সিংহের সঙ্গে ষাঁড় সঞ্জীবের বন্ধুত্ব করিয়ে দিল। পরে সেই মিত্রতা ভেঙে পিঙ্গলকে দিয়ে সঞ্জীবকে হত্যা করে। মিত্রভেদে এরকম আরো গল্প আছে।

দমন ও সঞ্জীব

দক্ষিণদেশে এক নগরী ছিল। তার নাম মহিলারোপ্য। সেখানে বর্ধমান নামে এক ধনী বণিক ছিল। সে দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করে। একবার সে মথুরায় বাণিজ্য করতে চলল। মথুরার চাহিদা অনুযায়ী সে ভালো ভালো জিনিসে গাড়ি বোঝাই করল। সঙ্গে আরও কয়েকজন বণিক চলল।

বর্ধমানের ছিল দুটি জোয়াল ও তেজী ষাঁড়। তাদের নাম সঞ্জীব ও নন্দন। তাদের শিং-দুটি তলোয়ারের মতো। খায় হাতির মতো, চলে ঘোড়ার বেগে। বর্ধমান সেই ষাঁড়-দুটিকে গাড়িতে জুতে নিল। বন্ধু বণিকেরাও গাড়ি নিয়ে সঙ্গে চলল।

মথুরা নগরীর কাছে যমুনা নদীর কূল দিয়ে যাওয়ার সময় গভীর কাদায় সঞ্জীবের পা মচকে গেল। সঞ্জীবের কষ্ট দেখে বর্ধমান খুব দুঃখ পেল। বাধ্য হয়ে সে তিন দিন যাত্রা পিছিয়ে দিল।

বর্ধমানের সঙ্গীরা একটা ষাঁড়ের জন্য এভাবে পড়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। পাশে বন, হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আছে চোর-ডাকাতের উৎপাত। বর্ধমান বলল, ভয় কী, আমাদের লোকজন আছে, অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব নেই। সঞ্জীব ভালো হয়ে উঠলেই রওনা দেব। কিন্তু তিন দিনেও সঞ্জীব ভালো হয়ে উঠল না। সঙ্গের বণিকেরা আর অপেক্ষা করতে রাজি হল না। বর্ধমান বাধ্য হয়ে সঞ্জীবের জন্য দু' জন পাহারাদার রেখে দলের সঙ্গে চলে গেল। যাওয়ার সময় পাহারাদারদের বলল, সঞ্জীব ভালো হয়ে উঠলে তাকে নিয়ে মথুরায় চলে এসো। ও আমার বড় প্রিয় ষাঁড়।

দু' দিন পর পাহারাদারেরা প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বলল, সঞ্জীব মরে গেছে। তাকে যমুনার তীরে সমাহিত করে এসেছি।

প্রিয় ষাঁড়ের মৃত্যুতে বর্ধমান খুব দুঃখ পেল। এদিকে পাহারাদার দু'জন চলে যাওয়ার কয়েক দিন পরেই সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর কাদা থেকে উঠে যমুনার

তীরের পান্নার মতো সবুজ ঘাস খেয়ে সঞ্জীব আগের মতো তাগড়া হয়ে উঠল। সে যমুনার পাড়ে ঘুরে বেড়ায়, শিঙের গুঁতোয় মাটির ধুলো ওড়ায় আর মাঝে মাঝে আষাঢ়ের মেঘের মতো হাঁক ছাড়ে।

সেই বনের পশুরাজ পিঙ্গল একদিন যমুনায় পানি খেতে এল। এমন সময় দূর থেকে সঞ্জীবের মেঘের মতো গর্জন শুনে ভড়কে গেল। কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু কাছাকাছি আছে জেনে সে নদীতে নামতে সাহস পেল না। একটা ঘন ঝোপে বসে চিন্তিত হয়ে বসে পড়ল।

পিঙ্গলের সঙ্গে মন্ত্রী, পাত্রমিত্র সবাই ছিল। তারাও কিছু বুঝতে না পেরে পিঙ্গলকে ঘিরে একে একে চুপ হয়ে গেল। এদিকে দুটি শেয়াল পশুরাজের পিছন পিছন ঘুর ঘুর করতো। তারা হল এক মন্ত্রীর ছেলে। পশুরাজ তাদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছিল। তারা হারানো চাকরি ফিরে পাওয়ার মতলবে আশেপাশে ঘোরাফেরা করে সুযোগ খুঁজতে লাগল।

দুই শেয়ালের একজনের নাম করট অন্যজনের নাম দমন। তাদের চালাকি ও বুদ্ধির শেষ ছিল না। পশুরাজের এই অবস্থা তাদের নজর এড়াল না।

দমন তখন করটের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ব্যাপার কী বল তো? পানি খেতে এসে মহারাজ ভয় পেলেন কেন?

করট বলল, ও নিয়ে তোর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

দমন বলল, বললেই হল! মহারাজ ভয় পেলেন কেন জানতে হবে। এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

করট বলল, মহারাজ ভয় পেয়েছেন বুঝলে কী করে?

দমন বলল, চালচলন দেখে। হাবভাব ও ইশারা, নড়াচড়া ও বসে থাকা দেখে? এই হল উপযুক্ত সময়। বুদ্ধির জোরে এখন মহারাজের ভয় দূর করে মন্ত্রিত্বটা বাগিয়ে নিতে হবে। চল।

করট বলল, সে তুই বুঝে নে। আমি ওর মধ্যে নেই। এই আমার চরণ চলল। বিদায়।

করট চলে গেল, দমন চলল পিঙ্গলের কাছে। দমনকে দেখে পিঙ্গল বলল, আরে দমন যে। এসো এসো। এতদিন তোমাকে দেখি নি কেন?

দমন দূর থেকে দু' হাত জোড় করে মহারাজকে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, আমাদের নিয়ে মহারাজের আর কী দরকার। তবে সময় হয়েছে বুঝে এসেছি। বড় হোক, ছোট হোক, সবাইকে মহারাজের দরকার হয়। সাত পুরুষ ধরে আমরা মহারাজের চাকর, তাই আপদে-বিপদেও মহারাজের কাছে থাকতে হয়। তবে সামান্য শেয়াল বলে অবহেলা করলে বলব, এটা কিন্তু উচিত নয় মহারাজ।

পিঙ্গল বলল, তা আর বলতে! তুমি হলে আমাদের সাত পুরুষের মন্ত্রীপুত্র। তা

পিঙ্গল দেখল সঞ্জীবের চোখ লাল, নাক ফুলিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে।

দমন তখন মহারাজের আরও কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে বলল, একটা কথা বলার ছিল, কথাটা কিন্তু গোপনীয়।

মহারাজ বলল, বটে বটে! এই বলে বাঘ, চিতা ও নেকড়েদের ইশারায় সরিয়ে দিল।

দমন ফিসফিস করে বলল, মহারাজ পানি খেতে এসে ফিরে এলেন যে বড়!

পিঙ্গলের রাজোচিত শৈর্যে ঘা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, এখনো তেমন তেষ্টা পায় নি।

দমন বলল, অবশ্য বলার মতো না হলে বলবেন কেন। সবসময় সব কথা সকলকে বলা উচিতও নয়।

পিঙ্গল ভাবল, এতো দেখি দিব্যি আমার মনের কথা আঁচ করে বসে আছে! হ্যাঁ, একে বলা যায়। এরকম বুদ্ধিমানের পরামর্শ চাওয়া যেতে পারে। এই ভেবে বলল, আচ্ছা দমন, দূর থেকে মাঝে মাঝে 'হা-কুড়ুৎ হা-কুড়ুৎ' একটা বিকট আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ? ওই যে মেঘের মতো গর্জন?

দমন চিন্তিত হওয়ার ভান করে বলল, পাচ্ছি মহারাজ। কিন্তু তাকে কী?

তখন পিঙ্গল খোলাখুলি বলে দিল, আমি আর এই বনে থাকছি না।

কেন কেন, মহারাজ?

যার আওয়াজ, শুনেই প্রাণে গুড় গুড় শব্দ ওঠে, না জানি সে কেমন হবে। দমন

হাসি চেপে বলে উঠল, মহারাজ দেখি শব্দ শুনেই ভয় পেয়ে গেলেন।

ভয় কি একা আমার? প্রজারাও ভয় পেয়ে গেছে। বাঘ, চিতা, নেকড়ে সবাই।

দমন বলল, তাদের আর দোষ কী! মহারাজকে যেমন দেখবে তারাও তাই করবে। যাক, আপনি ও-নিয়ে ভাববেন না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুণি জেনে আসছি ব্যাপারটা কী! তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

পিঙ্গল চোখ বড় বড় করে বলল, বলো কী! তুমি সেখানে যাবে?

দমন বলল, আমি তো আপনার সামান্য ভৃত্যমাত্র। আপনার জন্য করতে পারি না এমন কাজ নেই। জানটাও দিতে পারি।

এই বলে সিংহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই শব্দের দিকে সে চলল। দমন চলে গেলে পিঙ্গলের বুকে আবার দুরু দুরু শুরু হল। সে ভাবল, ঝোঁকের মাথায় সব কথা বলে ফেললাম। ওর চাকরিটাও খেয়েছি। সেই রাগে এখন যদি বদলা নেয়ার সুযোগ নেয়? প্রতিহিংসা জেগে ওঠে! না, ওর মতলবটা ভালো করে বোঝা দরকার। এসব ভাবতে ভাবতে সে সেখান থেকে উঠে অন্য একটা জায়গায় গিয়ে দমনের অপেক্ষায় বসে রইল।

দমন শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখে কী একটা ষাঁড়। সঙ্গে সঙ্গে সে মতলব ভেজে নিল। ভালোই হল, এর সঙ্গে ভাব জমাতে হবে। একে কাজে লাগাতে পারলে রাজা পিঙ্গল একেবারে মুঠোয় চলে আসবে। হাজার বন্ধু হলেও বিপদে না পড়লে রাজা মন্ত্রীর কথাও কানে নেয় না। কোনো পরামর্শকে পরামর্শ মনে করে না। এখন মোক্ষম সুযোগ।

দমন আস্তে আস্তে ফিরে এসে পিঙ্গলের পাশে এসে বসল।

পিঙ্গল মনের ভাব গোপন করে বলল, কী হে, শব্দটার কিছু হদিস পেলে? জন্তুটা কি? কোনো কথা বলছ না যে!

দমন বলল, মহারাজের অনুগ্রহে দেখে এসেছি।

সত্যি বলছ? তাকে দেখেছ?—পিঙ্গল বলল।

মহারাজের সামনে মিথ্যে বলব না।—দমন বলল।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। তাহলে বুঝতে পারছি এখন বড়রা কেন সামান্য লোকের ওপর রাগ করেন না। তাই হয়তো তিনি তোমাকে প্রাণে মারেন নি।

দমন এবার বলল, তা হবে হয়তো! তবে আপনি যদি চান ওকে এই মুহূর্তে আপনার পায়ের কাছে এনে দিতে পারি।

পিঙ্গল বলল, বলো কী! সত্যিই!

দমন বলল, মহারাজ, বলে যা হয় না কৌশলে তা হয়।

পিঙ্গল বলল, তা যদি হয় তাহলে এখন থেকেই তুমি আমার মন্ত্রী। রাজ্য, রাজা, প্রজা তোমার শাসনেই সব চলবে। এই আমার ফরমান।

শুনে দমন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না। ছুটে গেল যমুনার তীরে,

সঞ্জীবের কাছে। গিয়ে এক হাঁক দিল, এই পাঁজি ষাঁড়, তখন থেকে গাঁক গাঁক করে চিৎকার করছ, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? শিগ্‌গির চলো, আমার মনিব মহারাজ পিঙ্গল তোমাকে ডেকেছেন।

শুনে সঞ্জীব বলল, কে মহারাজ, কে পিঙ্গল, কোথায় থাকে?

দমন বলল, মনের সুখে বনের ঘাস খাচ্ছ আর বনের রাজা সিংহ পিঙ্গলকে চেন না? চলো, উনি সভাসদ নিয়ে বসে আছেন।

শুনে সঞ্জীবের প্রাণ উবে যায় যায়। বুকে কাঁপুনি ছুটে গেল। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, ভাই, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভালো মানুষ। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। তবে তিনি যাতে আমার ওপর রুষ্ট না হন সেটি ভাই তুমি করে দিও।

দমন বলল, এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা। তুমি তাহলে এখানে দাঁড়াও। মহারাজের সঙ্গে কথা বলে তোমাকে নিতে আসব। তিনি যদি এখন বিশ্রাম নিতে চান, তাহলেও এসে তোমাকে বলব।

এই বলে সে খুশিতে নাচতে নাচতে পিঙ্গলের কাছে চলে এল। বলল, মহারাজ, সব খোঁজ-খবর নিয়েই এলাম। সে মোটেই হেলাফেলার নয়। ইয়া মোটা শরীর, তলোয়ারের মতো দুটি শিং, আর খুরগুলো দু' ভাগ করা, শাবলের মতো ধারালো। যমুনার তীরে থাকবে বল কৈলাশ থেকে চলে এসেছে।

পিঙ্গল বলল, আমি ডাক শুনেই বুঝেছি জাঁদরেল কেউ হবে। না হয় আমার মতো হিংস্র জন্তুর রাজ্যে এসে এত হাঁকডাক করার সাহস হয়? তা তুমি কী বললে তাকে?

দমন বলল, আমাদের প্রভু পিঙ্গল হল পশুদের রাজা, তাঁর কথায় সবাই ওঠ-বস করে। আর বললাম, চলো, আমার প্রভুর সঙ্গে দেখা হবে। তখন ষাঁড় বললে, তোমার প্রভু অভয় দিচ্ছেন তো? আমি বললাম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! তখন সে বলল, তাহলে আমি যাই! এখন মহারাজ যা বলেন।

দমনের কথায় খুশি হয়ে পিঙ্গল বলল, শাবাশ মন্ত্রী, তুমি আমার মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য বটে। যাও, আমি অভয় দিচ্ছি, তুমি তাকে নিয়ে এসো।

পিঙ্গলের কথায় দমনের মন আনন্দে নেচে উঠল। এতদিনে পশুরাজ মুখ তুলে চেয়েছেন। আর তার মন্ত্রিত্ব কে নেয়! সে অমনি ছুটল সঞ্জীবের কাছে।

সঞ্জীব শুকনো মুখে তার পথ চেয়ে আছে। ঘাস খাওয়া তার বন্ধ। দমন এসেই বলল, বন্ধু, আর ভয় নেই, মহারাজ অভয় দিয়েছেন। তবে একটা কথা মহারাজের খাতির পেয়ে আমার কথা ভুলে যেও না যেন, আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না। আমার কথা শুনতে হবে। আমি তোমার পরামর্শ নিয়ে মন্ত্রীর আসনে বসে রাজ্য চালাব।

সঞ্জীব বলল, এই বনে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। তুমি শুধু মহারাজকে সামলে-সুমলে রেখ।

সঞ্জীব চলে এল পিঙ্গলের কাছে। আলিঙ্গন করে পাশাপাশি বসে গল্প-গুজব শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যে দু' জনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। এক সময় পিঙ্গল বলল, তুমি এই বনে নির্ভয়ে থাকবে। কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তবে যথা সম্ভব আমার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করো। এর পর পিঙ্গল যমুনায় গিয়ে পেট পুরে পানি খেয়ে এল। তৃষ্ণায় তার বুকের ছাতি ফেটে যেতে বসেছিল।

পরদিন পশুরাজ দমন ও করট দুই ভাইকে সবার সামনে আবার মন্ত্রীপদে বহাল করল। বনের মধ্যে আবার শান্তি ফিরে এল। দেখতে দেখতে পিঙ্গল ও সঞ্জীবের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। এক সঙ্গে ওঠ-বস, একসঙ্গে নাওয়া-খাওয়া, ঘুমানো সবকিছু চলতে লাগল। দুই বন্ধুতে যখন গল্প করতে বসে তখন পিঙ্গলের কড়া হুকুম কেউ যেন তাদের বিরক্ত না করে। রাজ্যের যত ঝক্কি-ঝামেলা, বিচার-আচার, রাজ্য রক্ষা সব দমন ও করটের দায়। এখন আর পিঙ্গল কিছুই দেখে না।

এভাবে বেশি সময় গল্প-গুজবে কাটে বলে পিঙ্গলের সময়মতো শিকারে যাওয়া হয় না। ফলে দমন ও করটকে প্রায় দিন না খেয়ে থাকতে হয়। অন্য পশুদেরও একই অবস্থা। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাদের মধ্য থেকে একটি দল অন্য বনে পালিয়ে গেল। দমন মহাচিন্তায় পড়ে গেল।

করট তখন বলল, তুমিই তো হাতে ধরে তাকে নিয়ে এসেছ। এখন নিজের আগুনে নিজে পুড়ে মরো।

দমন বলল, তা বলেছ ঠিক। তবে ওদের মধ্যে ভাব জমে ওঠার কারণ যেমন আমি তেমনি তা ভাঙতেও পারি।

করট আঁতকে উঠে বলল, অমন আহাম্মুকি ভুলেও করতে যেও না। বিপদে পড়বে। সঞ্জীবের গায়ের জোর তোমার আমার চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ গুণ হবে। ওর একটা লাথিই যথেষ্ট আমাদের জন্য।

দমন বলল, গায়ের জোরে সব কিছু হয় না রে! আমি করব বুদ্ধির জোরে। জোর যার মুল্লুক তার নয়, বুদ্ধি যার মুল্লুক তার। বুদ্ধি দিয়েই দুই বলবানকে ঘায়েল করব। তখন দেখবে কেউ কারো ছায়াও মাড়াবে না। এমনকি একে অন্যকে আক্রমণ করতে ছাড়বে না। মনে রেখো আমার নাম দমন হ্যাঁ।

করট বলল, তাহলে তো ভালোই। দেখো চেষ্টা করে।

দু'জনে পরামর্শ করলেও দমনের চোখ সবসময় ছিল পিঙ্গল ও সঞ্জীবের দিকে। এক সময় দেখল মহারাজাকে রেখে সঞ্জীব যমুনার দিকে চলে যাচ্ছে। পানি খেতে নয়তো গা-টা ধুয়ে নিতেই হয়তো যাচ্ছে। দমন তখন সুযোগটা নিতে ছাড়ল না। সে আর দেরি না করে পিঙ্গলের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলল, মহারাজের জয় হোক।

পিঙ্গল বলল, কী ব্যাপার! তোমাকে তো দেখাই যায় না।

দমন বলল, মহারাজ সবসময় ব্যস্ত থাকেন তাই আসি না। কিন্তু আজ বাধ্য

হয়ে এলাম। আপনার বিপদ-আপদ আর অমঙ্গল দেখলে তো না এসে পারি না।

কী হয়েছে বলো তো?

একটা কথা না বলে আর পারছি না। আপনার বন্ধুর মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না। সে আপনার ক্ষতি করতে চায়। কাল সে আমাকে আড়ালে ডেকে বলে কি না, তোমাদের পিঙ্গলের এলেম আমার জানা হয়ে গেছে। ভাবছি ওটাকে মেরে আমি রাজা হব, তুমি তবে আমার প্রধানমন্ত্রী।

শুনেই পিঙ্গল গোঁ গোঁ ঘর ঘর করে অজ্ঞান। দমন তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে পানির ছিটে দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

পিঙ্গল তখন আস্তে আস্তে বলল, অমন অসম্ভব কথা তুমি মুখেও এনো না। ও হল আমার প্রাণের বন্ধু, জিগরের দোস্ত। ও কখনো আমার ক্ষতি করতে পারে না।

দমন বলল, ওই ঘাসখোর জন্তুটাকে অপাত্রে ভালোবাসা দিলেন। ও আপনার কোন কাজে আসবে শুনি! ওর নোখ, দাঁতের কী তেজ আছে? আপনার সঙ্গে গল্প করে করে আপনাকে অলস করে দেওয়াই ওর উদ্দেশ্য। আপনার শত্রুরা খায় মাংস, করে শিকার। আর ও ঘাস খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করছে। আপনাকে অকর্মণ্য করে দেওয়াই তার লক্ষ। তারপর একসময় তার বিশাল শরীরটা নিয়ে আপনার ওপর চেপে বসবে না তাই-বা কে বলবে! আজই ওটাকে শেষ করুন।

না, অমন অন্যায় আমি করতে পারব না। আমার রাজ্যে আইন আছে। সেই আইন আমার বানানো। তাছাড়া আমি নিজে তাকে অভয় দিয়েছি। তুমি যাই বলো সে আমার পরম বন্ধু। তার সঙ্গে গল্প করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। মানুষের স্বভাবের অনেক খবর জেনে নিয়েছি। সে যদি আমাকে মারতে চায় মারুক। আমি তার গায়ে আঘাত করতে পারব না।

দমন বলল, এক ঘাসখোর, কোথা থেকে এসেছে তার ঠিক নেই, আপনি তার মনের খবর সব জানেনও না বোঝেনও না। আমি হলাম আপনার চিরকালের আপনজন। এখন আমাকে ছেড়ে যদি ওই ঘাসখোরকে আপন ভাবেন তাহলে কাজটা কি ভালো হবে? কী আর বলব, আমি আপনার মন্ত্রী বলেই সময়মতো আপনাকে সজাগ করে দিতে এসেছি। আপনজনকে পর এবং পরকে আপন করে ঘরে ঠাঁই দিলে ফল কখনো ভালো হয় না। আমার তিন পুরুষ আপনার মন্ত্রী ছিলেন, তাই বলছি।

পিঙ্গল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল, সঞ্জীব যে আমাকে মারতে চায় তার প্রমাণ?

দমন এবার নড়ে চড়েবলল, তাহলে আসল কথাটা শুনুন মহারাজ। সে ঠিক করেছে কাল সকালেই সে আপনাকে মারবে। দেখবেন চোখ লাল করে নাক ফুলিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আপনার দিকে এগিয়ে আসবে।

তখন আপনার যা উচিত মনে হয় করবেন। আমি মন্ত্রী হিসাবে আপনাকে জানিয়ে দিয়ে আমার কর্তব্য করলাম। আমার কাজে অবহেলা নেই।

এই বলে বিদায় নিয়ে দমন চলে গেল। কিন্তু ঘুরে ঘুরে চুপি চুপি গেল সঞ্জীবের কাছে যমুনার ধারে। সঞ্জীব ঘাস খাওয়া ছেড়ে বলল, এসো এসো ভাই দমন, তোমার তো দেখা পাওয়াই ভার। কাজ নিয়েই তুমি সারাদিন পড়ে থাকো।

দমন বলল, বন্ধু, বেশি কথা বলার সময় নেই। একটা কথা তোমাকে বলতে এলাম। তুমি প্রথম পরিচয়ের দিন আমাকে বলেছিলে, 'তুমি শুধু মহারাজকে সামলে-সুমলে রেখ।' আজ তোমাকে বলছি পিঙ্গলের মতলব ভালো নয়। তুমি এই বন ছেড়ে এক্ষুণি পালিয়ে যাও।

সঞ্জীব বলল, কেন, তার আবার কী মতলব হল?

দমন বলল, আজ পিঙ্গল আমাকে ডেকে বলল ষাঁড়টার গায়ে-গতরে বেশ চর্বি জমেছে, ওকে মেরে কাল বনের পশুদের ভোজ খাওয়াব। ওরা আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে শুনেছি, ওদের তুমি ডেকে নিয়ে এসো। আমি বললাম, সে কী কথা মহারাজ! সঞ্জীব আপনার প্রাণের বন্ধু, তাকে মারবেন বলছেন?

আমার কথা শুনে গর্জে উঠে বলল, কে বন্ধু? ঘাসখোর কখনো সিংহের বন্ধু হয়? ঘাসখোরদের খেয়েই তো সিংহেরা বাঁচে। কথা শুনে আমি সোজা তোমার কাছে চলে এলাম।

এই কথা শুনে সঞ্জীব টলতে টলতে শুয়ে পড়ল। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, এসব তুমি কী বলছ? ও আমাকে ছেড়ে এক দণ্ডও থাকতে পারে না, সারাক্ষণ আগলে রাখে, রাতে একসঙ্গে থাকি। না, না, সে কী না আমাকে... না, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বাস যদি না করো আমি আর কী করতে পারি। তুমি আমাকে সেই প্রথম দিন বলেছিলে বলে সময়মতো তোমাকে সাবধান করতে এলাম। এখন তুমি যদি আমাকে বন্ধু না ভাব কী করা! রাজায়-মন্ত্রীতে যে কথা হয় তা-তো আর সবাই জানতে পারে না! তুমি শুনেও যদি বিশ্বাস না করো আমার কী! আমি গেলাম।

সঞ্জীব বলল, রাগ করো না ভাই। আমি সবই বুঝতে পারছি। পিঙ্গল আমায় মন থেকে ভালোবাসে আমি জানি। কিন্তু পাত্র-মিত্র সবাই তো আর সমান নয়। আমার ওপর মহারাজার ভালোবাসার টান দেখে অনেকেই হিংসায় জ্বলে মরছে। তারা নানা কথা বলে পিঙ্গলের মন বিষিয়ে তুলেছে। নয়তো আমাকে মারার কথা তার মনেই আসতে পারে না!

দমন একটুও না ভেবে বলল, তা যদি হয় সেটা শান্ত করা কঠিন কিছু নয়। দুর্জনেরা যতই কুমতলব করুক ভালো কথা বলে মহারাজ পিঙ্গলকে বুঝিয়ে বললেই তিনি বুঝবেন। তখন তাঁর সব রাগ পানি হয়ে যাবে। মহারাজা মানুষটিও ওরকম। খুব ভালো।

সঞ্জীব বলল, তুমি কথাটা ঠিক বললে না। দুর্জন যতই তুচ্ছ হোক তাদের মধ্যে বাস করা যায় না। আজ হোক, কাল হোক, একদিন কুমতলব হাসিল করবেই। এখন তুমিই আমাকে পরামর্শ দাও আমি কী করব। কী করা উচিত আর অনুচিত।

দমন বলল, আমার কিছুই ভালো ঠেকছে না। তুমি বরং অন্য কোথাও চলে যাও। নয়তো বাঁচতে পারবে না।

সঞ্জীব এক মোচড় মেরে শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ালো। বলল, না, আমি পালাব না। আমি কোনো দোষ করি নি। আমি ভীরুও নই। গায়ে আমার শক্তিও কিছু কম নেই। দরকার হলে যুদ্ধ করব, লড়াই করেই বাঁচব। আমার শিং-দুটো দেখছে তো!

একথা শুনে দমন খুব ঘাবড়ে গেল। সে ভাবল, সর্বনাশ, সঞ্জীবের যা মতিগতি দেখছি যদি অঘটন কিছু ঘটে যায়। তাহলে একূল-ওকূল দু' কূলই গেল। কিন্তু সে ভালো করেই জানে ষাঁড়ের আস্ফালন বেশিক্ষণ নয়। সে ভয় পাওয়ার ভান করে বরং ষাঁড়কে উত্তেজিত করে দিতে চাইল।

দমন এবার বলল, ঠিক বলেছ তুমি। পালাবে কেন? তুমি তো কোনো দোষ করো নি, আর কাপুরুষও নও। তবে কি জানো, যুদ্ধে নামার আগে শত্রুর শক্তি সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া ভালো। বুদ্ধিমানের কাজ।

সঞ্জীব আবার বলল, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে পিঙ্গল আমাকে মারতে চায়। হাবেভাবেও কিছু দেখতে পাই নি।

দমন বলল, বিশ্বাস তোমার ঠিকই হবে যখন তুমি দেখবে তার লাল চোখ। ভুরু কুঁচকে তোমার দিকে তাকিয়ে জিভ চাটছে। তবে আমি বলি কি অত দেখাদেখির কী দরকার। মাংসাশী প্রাণীর সামনে পড়ার চেয়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ রাতেই তুমি চলে যাও। এই বন ছাড়া দুনিয়ায় আর জায়গা নেই নাকি!

সঞ্জীব সব শুনল। দমনের পরামর্শ শুনে রাখল। কিন্তু কিছু বলল না।

দমন কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, তাহলে চললাম। বলেই সে এক দৌড়ে করটের কাছে চলে এল।

করট বলল, কী ব্যাপার, তোমাকে খুব খুশি খুশি দেখছি!

আমার অভিযানের কথা শুনলে তুমিও খুশি হবে দাদা। আমি তোমার ছোট হলেও আমার ওপর আস্থা রেখ। এই মাত্র আমি যে বীজ পুঁতেছি তার অঙ্কুর দেখলাম। অঙ্কুর থেকে চারা বাড়ছে তাও দেখে এলাম। বুদ্ধির খেলা দিয়ে মিথ্যের জাল বুনে পিঙ্গল আর সঞ্জীবের মাঝখানে তুলে দিয়েছি সন্দেহের দেয়াল। সেটা ওরা আর কোনোদিন পার হতে পারবে না। পাশাপাশি বসার কথাও ভুলে যাও। দুই বলবানের ও দুই বন্ধুর মধ্যে একবার সন্দেহ ঢুকলে আর রক্ষে নেই।

করট বলল, অমন বন্ধুত্বটা ভেঙে দিলে? কাজটা কি ভালো করলে?

না করে উপায় ছিল না দাদা, ওরা দু' জনই আমাদের শত্রু। একটা তো পিঙ্গল

নিজেই, সে একবার মন্ত্রিত্ব কেড়ে নিয়েছিল। আর অন্যটাকে বন্ধু করে এনে আমাদের না খেয়ে মরার অবস্থা। আসল কথা হল আগে নিজে বাঁচা, তারপর অন্য কিছু।

করট বলল, সবই বুঝলাম। এখন সব ভালো যার শেষ ভালো।

ওদিকে যমুনার তীরে সঞ্জীব চোখের জলে ভাসছে। বন্ধুর কথা যতই ভাবে ততই মনটা উতলা হয়ে ওঠে। এমন বন্ধুত্বের ফাটল ধরল কী করে। দমনের কথাও পুরোপুরি অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেবে তাও পারছে না। সন্দেহ কিছুতেই ছাড়ছে না। সারাটা রাত বেচারি চোখের পানিতে ভেসে কাটাল। দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে লাল হয়ে গেল।

সকাল হতেই সে উঠে দাঁড়াল। সে ভাবল, যাই হোক, একবার পিঙ্গলের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অন্য কোথাও গিয়ে কোথায় বেঘোরে মরা পড়ি, তার চেয়ে বন্ধুর হাতে মরাই ভালো। আবার ওর শরণ নিলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারি।—এই ভেবে সে টলতে টলতে পিঙ্গলের কাছে গেল।

পিঙ্গল সঞ্জীবের অপেক্ষায় ছিল। গুহার সামনে তাদের দেখা হল। তার চোখ থেকেও অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে। দমনের কথা শোনা অব্দি সে কেবল ফোঁস ফোঁস করছে। সে দেখল সঞ্জীবের চোখ লাল, নাক ফুলিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। দমনের কথার সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। দুঃখে ও ভাবনায় তার ঠোঁটও ভিজে শুকিয়ে গেল। ওদিকে সঞ্জীব দেখল, পিঙ্গলের চোখ লাল, ভুরু কুঁচকে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। দেখে তারও মনে পড়ে গেল দমনের কথা। দুঃখে ও ভাবনায় তার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। আর কী, সব মিলে যাচ্ছে।

আক্রান্ত হওয়ার সমস্ত লক্ষণ দেখতে পেয়ে পিঙ্গল আর সময় নষ্ট করে বসে থাকতে পারল না। প্রচণ্ড এক গর্জন করে সে সঞ্জীবের ওপর লাফিয়ে পড়ল। সঞ্জীবও তৈরি ছিল। ঘাড় নিচু করে সে পিঙ্গলকে শিঙের ওপর তুলে নিল। তারপর ছুড়ে মারল দূরে। শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। পিঙ্গলের থাবা ও দাঁতের কামড়ে সঞ্জীবের কাঁধ ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। সঞ্জীবের শিঙের গুঁতোয় সিংহের পাঁজরের চামড়া চিরে রক্ত ঝরছে। দু' জনে আর কেউ কারো বন্ধু রইল না। দুই চরম শত্রুর মধ্যে চলল প্রচণ্ড লড়াই।

করট ও দমন দু' জনের লড়াই দেখবে বলে পাশের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মরণপণ লড়াই দেখে করট বলল, সর্বনাশ, এখনও সময় আছে, শিগগির ওদের থামা। এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়।

দমন বলল, দেখো না দাদা, চুপ করে শুধু দেখে যাও।

পিঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে সঞ্জীব তখন ভয়ানক আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। নোখ ও দাঁতের আঘাতে তার সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সঞ্জীব মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে শেষ পর্যন্ত মরে গেল।

বন্ধুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে পিঙ্গল হায় হায় করে উঠল। সঞ্জীবের গুণের কথা একে একে সব মনে পড়তে লাগল। চোখ দিয়ে তার টুপ টুপ করে অশ্রু ঝরে পড়ল। সে হায় হায় করে বলে উঠল, হায় কী পাপী আমি! সঞ্জীবকে এভাবে হত্যা করলাম? হায় হায়, আমি যে আমার বনে তাকে অভয় দিয়েছিলাম। সে আমার শরণ নিয়েছিল। সভায় ওর কত প্রশংসা করেছি–তাদের কাছে এখন আমি মুখ দেখাব কী করে, কী বলে যুক্তি দেখাব?

এমন সময় দমন এসে বলল, মহারাজ, এভাবে দুঃখ ও বিলাপ করা আপনার উচিত কাজ নয়। আপনি হলেন রাজা, সঞ্জীব ছিল আপনার গোপন শত্রু। শত্রুকে শেষ করা রাজার উচিত কাজ। আপনি তাকে না মারলে সে আপনাকে শেষ করত। আপনি রাজার মতো কাজ করেছেন। এখন আপনি শান্ত হোন।

দমনের কথা শুনে পিঙ্গল চেতনা ফিরে পেল। সে বলল, দমন, তুমিই আমার বিপদের বন্ধু। তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।

দমন বলল, মহারাজ, আমি আপনার সেবক, আপনার সেবা করাই আমার কাজ। এজন্যই তো আমি আছি।

তারপরও দমন নানাভাবে পিঙ্গলকে বোঝাল। তাতে পিঙ্গল অল্প দিনের মধ্যে সঞ্জীবের শোক ভুলে গেল। তারপর মন্ত্রী দমনকে নিয়ে আবার শিকার করে রাজ্য চালাতে লাগল। দমনের সুখের আর সীমা নেই।

দতিল ও গোরভ

প্রাচীন বর্ধমান নগরে ছিল এক ধনী বণিক। দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করত। বাণিজ্য করে সে প্রচুর টাকা-কড়ি করে। লাভের টাকা থেকে সে অনেক টাকা দেশের লোকের জন্য খরচ করত। যে গ্রামে পানির কষ্ট সেখানে পুকুর করে দিত। লেখাপড়ার জন্য স্কুল করে দিত। রাস্তাঘাট বানিয়ে দিত। সবচেয়ে বড় কথা লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করত। অভাবী লোক তার কাছ থেকে কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না। এজন্য লোকজন তাকে খুব ভালোবাসত আর ধন্য ধন্য করত।

দেশের লোকজনের সেবা করে পাছে রাজার কোপে না পড়ে সেজন্য রাজাকেও সে খুশি রাখার চেষ্টা করত। প্রতিদিন সকালে রাজ দরবারে গিয়ে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে কুশল সংবাদ নিয়ে আসত। রাজাও তার উপর এজন্য খুব খুশি, তাকে খাতির-যত্ন করে।

এভাবে দতিল রাজার কোপে না পড়ে সেজন্য রাজাকেও সে খুশি রাখার চেষ্টা করত। প্রতিদিন সকালে রাজ দরবারে গিয়ে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে কুশল সংবাদ নিয়ে আসত। রাজাও তার ওপর এজন্য খুব খুশি, তাকে খাতির-যত্ন করে।

এভাবে দতিল রাজা ও প্রজা সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

নিজের বিয়ে উপলক্ষে দতিল বর্ধমান নগরের সব লোককে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজ খাওয়াল। রাজা ও রানী থেকে সাধারণ ভিখিরি পর্যন্ত বাদ গেল না। দতিল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে আপ্যায়ন করল; কিন্তু তার মধ্যেই সে একটা ভুল করে বসল।

রাজাবাড়ির এক ভৃত্যের নাম গোরভ। সেও নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিল। কিন্তু খেতে বসার সময় বেচারী একটা গোলমাল করে বসল। করল কী, সে ভুল করে রাজপুরোহিতের বসার জায়গায় বসে পড়েছিল। দতিলও মাথা ঠিক রাখতে না পেরে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে বসল।

অন্য কিছু যেমন তেমন, অপমানের কথা কি মানুষ সহজে ভুলতে পারে। তার উপর রাজবাড়ির অন্দর মহলের ভৃত্য গোরভ। সে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অপমানের

প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসল। মনে মনে সে মতলব এঁটে সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

একদিন সবে ভোর হয়েছে। গোরভ গেল রাজার ঘর ঝাঁট দিতে। রাজারও তখন ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়েছে। রাজা জেগে গেছে জেনে গোরভ ঘর ঝাঁট দিতে দিতে নিজের মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, রাজা মশায়ের আসকারা পেয়ে দতিল বণিকটা খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। যখন তখন রাজামশায়ের অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করছে। আর রানীমার সঙ্গে কী সব ঘুসঘুস ফুসফুস করছে। কিন্তু কী বলছে বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার।

রাজার কানে কথাগুলো যেতেই তিনি রেগেমেগে বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরের লোক এসে রানীর সঙ্গে এভাবে কথা বলে যাচ্ছে? অথচ তিনি কিছুই জানতে পারছেন না?

রাজা গোরভকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, দতিলের নামে কী সব বলছিস শুনলাম? কী হয়েছে বল তো?

গোরভ হাতের ঝাড়ু ফেলে দিয়ে এক বার জোড় হাত করে আবার কান মলে বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে মহারাজ। কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি। শুধু ঘুম পাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কী বলতে কী বলে ফেলেছি, মনে নেই। মাপ করে দিন মহারাজ।

রাজা এই নিয়ে আর কিছু বললেন না। কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহটা চেপে রইল। দতিলকে সেই থেকে তিনি বিষ নজরে দেখতে লাগলেন।

এদিকে রাজা দতিল আসে রাজামশায়কে প্রণাম জানাতে আর কুশল জানাতে। রাজা একদিন একটা সাধারণ কথা তাকে অপমান করে দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এতে দতিল খুব বিস্মিত হল। দুঃখও পেল। সে অপমানে মাথা নিচু করে ঘরে ফিরে এল। আর ভাবতে লাগল রাজা তাকে তুচ্ছ বিষয়ে এরকম অপমান কেন করলেন। কিন্তু ভেবে ভেবে কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

দু'দিন পরের কথায়। রাজা মশায়ের কোনো কারণে ভুল করে ফেলেছেন ভেবে দতিল আবার এল রাজাকে কুশল জানাতে। দতিল জানত না এদিকে রাজবাড়িতে ঢোকা তার জন্য বারণ হয়ে গেছে। রাজবাড়ির সিংহদরজার প্রহরীরা তাকে আটকাল। তারা বলল, রাজবাড়িতে আপনার ঢোকার হুকুম নেই।

ভৃত্য গোরভ কাছেই ছিল। সে মুখে বাঁকা হাসি দিয়ে প্রহরীদের বলল, সর্বনাশ, কাকে বারণ করছিস তোরা? এই বণিক হচ্ছেন রাজ মশায়ের আপন লোক। তাকে ঢুকতে না দিলে তোদের চাকরি থাকবে না।—এই বলে সে সেখান থেকে অমনি চলে গেল।

দতিল বুদ্ধিমান। গোরভের কথা শুনে তার মনে সন্দেহ হল। আর সেই মুহূর্তে ভোজের দিনের ঘটনাটার কথা মনে পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল তার এই অপমানের পিছনে গোরভের হাত আছে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে দতিল ভাবতে লাগল, দোষ আমারই হয়েছে। আমার বোঝা উচিত ছিল রাজার ভৃত্যকেও সম্মান দিতে হয়। সে যত নগণ্যই হোক রাজার সেবক। আর আমি কিনা তাকে করেছি অপমান। তার প্রতিশোধ সে এভাবে নিল।

সেদিন বিকেলেই দতিল গোরভকে ডেকে এনে খুব খাতির করে খাওয়াল। এক জোড়া দামি কাপড়, কিছু টাকা আর মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে বিদায় দিল। আর বলল, ভাই, সেদিন রাজপুরোহিতের জায়গায় তুমি বসে পড়েছিলে বলে ঝোঁকের মাথায় কী বলতে কী বলে ফেলেছিলাম। সেজন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। বলো, তুমি ক্ষমা করেছ?

এমন খাতির আর ভেট পেয়ে গোরভের রাগ পানি হয়ে গেল। সে খুশি হয়ে বলল, শেঠজী, আজ আপনি আমাকে সম্মান দেখালেন, আমিও মন থেকে সব মুছে ফেললাম। এবার রাজামশায়ও আপনার প্রতি প্রসন্ন হবেন। শেঠজী, বুদ্ধির জোরে কী না হয়।

পরদিন নিয়মমাফিক গোরভ রাজবাড়ি ঝাঁট দিতে গেল। রাজাও তখন বিছানা থেকে উঠি উঠি করছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন গোরভ আপন মনে কথা বলছে। সে বলছে, রাজামশায়ের কী রুচি। পায়খানায় বসে শশা খান। লোকে শুনলে বলবে কী!

শুনে তো রাজা রাগ হয়ে গেল। তিনি তড়াক করে পালঙ্কে উঠে বসলেন। রাগে তিনি জ্বলছেন। গোরভকে ডেকে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এই হতভাগা জানোয়ার, কী যা-তা বকছিস? অমন জায়গায় আমি শশা খেতে যাব কেন? তুই দেখলি কী করে? বল শিগ্‌গির, নইলে তোর গর্দান যাবে।

গোরভ অমনি হাতের ঝাড়ু ফেলে এক হাত জোড় করে আবার কান মলা খেয়ে বলে উঠল, দোহাই রাজামশায়, মাফ করে দিন। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। শুধু ঘুম পাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কী বলতে কী বলে ফেলেছি, মনে নেই।

রাজা বললেন, তাই বল হতভাগা।

রাজার রাগ পড়ে গেল। কিন্তু সন্দেহটা রয়ে গেল মনে। তিনি ভাবতে লাগলেন, কী বাজে কথা, জীবনেও আমি কখনো ওসব জায়গায় শশা খাই নি। হতভাগা গোরভটা দেখি ঘুমের ঘোরে বড্ড আবোল-তাবোল বকে। দতিল সম্পর্কেও নিশ্চয়ই তাই বলেছিল। দতিল সম্পর্কে কথাটা সে মোটেই সত্য নয় এখন বুঝতে পারছি। বিনা দোষেই সেদিন দতিলকে কী আমানটাই না করলাম। কাজটা মোটেই ভালো হয় নি। তার মতো মানুষ কখনো এরকম কাজ করতে পারে না। সে আমার প্রজা ও পরম হিতৈষী। প্রজাদেরও উপকারী বন্ধু।

রাজা সেদিনই দতিলকে ডাকিয়ে এনে খাতির করে দরবারে বসালেন। তারপর দামি উপহার তার হাতে তুলে দিয়ে নিজের আগের ব্যবহারের জন্য দুঃখ করলেন।

দতিল এভাবে তার আগের সম্মান আবার ফিরে পেল।

কাক, কেউটে ও সোনার হার

গ্রামের প্রান্তে এক বটগাছে এক জোড়া কাক বাসা বেঁধেছিল। সেই গাছের একটা কোটরে থাকত এক কেউটে। কাকিনী যতবার ডিম পাড়ে কেউটে এসে সেগুলো খেয়ে যায়।

কাক তো ভয়ে কেউটের কাছে এগোতে পারে না। তাই মনের দুঃখে তাদের দিন কাটে আর তার উপায় ভাবতে থাকে।

সেই গাছের গোড়ায় মাটির গর্তে থাকে এক শেয়ালি ও শেয়াল। কাকদের সে বন্ধু। কাকিনী ও কাক ভাবল কথাটা তাদের বন্ধুদের বলা দরকার। আবার যখন ডিম পাড়ার সময় হল তখন তারা বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইল।

বন্ধু আর তার বউকে দেখে শেয়ালি ভারি খুশি। শেয়াল তখন গর্তে ঘুমুচ্ছিল। শেয়ালি বলল, কী সৌভাগ্য আমার, অনেক দিন পরে তোমরা এভাবে আমাদের কাছে এলে। তা কেমন আছ বলো তো?

শেয়ালির কথায় কাকিনীর চোখ থেকে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছে সে তার দুঃখের কথা শুরু করল। কেউটের নিষ্ঠুরতার কথা খুলে বলল।

শেয়ালি বলল, দুঃখ করো না সখি, আমাকে যখন বলেছ তার উপায়ও আমি বলে দিচ্ছি। বিপদের দিনের বন্ধুই তো পরম বন্ধু। তোমরা আগে কেন একথা আমাকে বলো নি? তা যা হয়েছে হয়েছে। শোনো আমার প্রাণের সখি, কেউটের সঙ্গে গায়ের জোরে তোমরা পারবে না। তাকে শেষ করতে হবে কৌশলে। বলে যা হয় না কৌশলে তা হয়।

কাকিনী বলল, কেমন করে?

কাক বলল, কী সেই কৌশল?

শেয়ালি বলল, শোনে কাক বন্ধু, কালই তুমি পাশের শহরে চলে যাও। তুমি তো সব জায়গায় যাও, চেনাজানাও আছে। কোনো বড় লোকের বাড়ি থেকে একটা সোনার হার তুলে আনতে হবে। সেটা লোকে দেখে মতো তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে

বুদ্ধি করে এই গাছের কোটরে কেউটের গর্তে ফেলে দেবে। শুধু লক্ষ রাখবে লোকজন যাতে তোমাকে অনুসরণ করে পথ চিনে না আসতে পারে। তারপর দেখবে তোমাদের শত্রুর দফারফা।

পরদিন সকালেই কাকিনী ও কাক মিলে গেল শহরে রাজার বাড়িতে। তখন রাজবাড়ির পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে রাজকন্যা সখিদের নিয়ে স্নান করছিল। তার সোনার গয়নাগুলো ঘাটের শুকনো কাপড়ের উপর রাখা ছিল। রোদ পড়ে সোনার গয়না চকচক করছে। দূর থেকে কাক ও কাকিনী তা দেখতে পেল।

ঘাটের কাছের কদমগাছের ডালে কাকিনী ও কাক বসেছিল। কাকিনী বলল, শোনো কর্তা, কাজটা আমি খুব ভালোভাবে করতে পারব। তুমি শুধু দূর থেকে আমাকে পাহারা দেবে। বিপদের সম্ভাবনা দেখলে আগেভাগে জানিয়ে দেবে।

এই বলে কাকিনী ডাল থেকে চারদিক ভালো করে দেখে নিল। দেখল রাজকন্যা ও তার সখিরা নিজেদের মধ্যে জল ছিটিয়ে কেলী করছে। আশেপাশে লোকজনও নেই। হাজার হোক রাজকন্যা পুকুরে স্নান করছে, ধারেকাছে কেউ থাকতেই পারবে না। অমনি কাকিনী উড়ে এসে একখানা ভারি সোনার হার ঠোঁটে তুলে নিয়ে আকাশে দিল উড়াল।

রাজকন্যার সখিরা দেখে হৈ-চৈ জুড়ে দিল। চিৎকার শুনে রাজবাড়ি থেকে প্রহরীরা ছুটে এল। তারা দেখল একটা কাক রাজকন্যার সোনার হার নিয়ে উড়ে গিয়ে একটা ফাঁকা ডালে বসেছে। রাজার প্রহরীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে সেদিকে ছুটল। অমনি কাকিনী সে-ডাল থেকে ও-ডাল, সেখান থেকে আরেক গাছ করতে করতে একেবারে নিজের বটগাছে কেউটের কোটরের মুখে হারটা টুপ করে ফেলে দিল।

কাক ছিল পিছে পিছে। এবার দু' জনে মিলে পাশের অর্জুন গাছের পাতার আড়ালে বসে সব দেখতে লাগল। রাজার প্রহরীরা তো দেখতেই পেয়েছে হারটা বটগাছের কোটরে ফেলেছে। তাই তারা কাকের খোঁজ না করে হারের খোঁজে গাছে গিয়ে উঠল। হারটা কোটরের মুখে একটু করে দেখা যাচ্ছিল। একজন প্রহরী দেখতে দেখতে গাছে উঠে গেল। কোটরের কাছে পৌঁছতেই, কেউটে ফুঁসে উঠল। প্রহরী দেখল কোটরে আছে দুরন্ত এক কেউটে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোঁটাসহ আরও দু' জন প্রহরী উঠে গেল। কেউটে আবার মুখ বের করে ফুঁসে উঠতে তার মাথায় পড়ল লাঠির বাড়ি। কেউটের মাথা থেঁতলে গেল, আরো কয়েক ঘা মেরে তাকে শেষ করে সোনার হার নিয়ে এল তারা।

রাজকন্যার হার উদ্ধার হল। হৈ-চৈ করতে করতে প্রহরীরা চলে গেল রাজবাড়িতে। চারদিকে শান্তি নেমে এল।

কাকিনী ও কাক পরম শান্তিতে সেখানে ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে বাস করতে লাগল। শেয়ালিকে তারা ধন্যবাদ দিতে ভুলল না।

বক ও কাঁকড়া

বিলের ধারে এক সরোবর। তাতে আছে ছোট বড় নানা জাতের মাছ। সরোবরের পাশেই আছে এক বিশাল বটগাছ। তার বয়সের কোনো হিসেব-নিকেশ নেই। তাতে অনেক দিন ধরে বাস করে এক বক। তার বয়সও হয়েছে অনেক। বুড়ো হয়েছে বলে সে আগের মতো আর শিকার ধরতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে অনেক দিন আধ-পেট আর উপোস করেই কাটে।

না খেয়ে আর কত দিন থাকা যায়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এক ফন্দি বের করল।

একদিন সরোবরের তীরে বসে পানির দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। ফোঁটা ফোঁটা চোখের পানিও পড়তে লাগল সরোবরে। যেন দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে!

বুড়ো বককে এভাবে কাঁদতে দেখে এক কাঁকড়ার খুব মায়া হল। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে বুড়োকে প্রশ্ন করল, কী হল তোমার মামা? খাওয়া-দাওয়া ভুলে তুমি এভাবে কাঁদছ কেন?

কাঁকড়ার কথায় বকের দুঃখ যেন আরও উথলে উঠল। সে ভেউ ভেউ করে এক চোট কেঁদে নিয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়া করে আর কী হবে। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ও হো-হো-হো...!

কাঁকড়া বলল, সে তো তোমার কান্না দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু কারণটা কী বলবে তো!

বক বলল, সর্বনাশের কথা আর কী বলব! সেই ছেলেবেলা থেকে এই সরোবরের ধারে রয়েছে। তোদের দেখছি, তোদের বাপ-দাদাকে দেখেছি আরও কী দেখার আছে কে জানে! সর্বনাশটা ছুটে আসছে—ও হো-হো-হো...।

আরও এক চোট কেঁদে নিয়ে বক বলতে লাগল, কাল এক জায়গায় শুনলাম সর্বনাশটা এদিকে এগিয়ে আসছে, বারো বছর ধরে একনাগাড়ে খরা হবে। সেই খরায় নদী-নালা পুকুর-সরোবর সব শুকিয়ে যাবে। চোখের সামনে তোদের ছটফট

করে মরতে হবে, সেই দৃশ্য কী করে সইব বল ভাগ্নে? আমার তো না হয় বয়স হয়েছে; কিন্তু তোরা তো এখনও একেবারে অল্প বয়সের। আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না।

বকের কথা শুনে কাঁকড়া আঁতকে উঠল। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল। ধরা গলায় সে বলল, তাহলে তো খুব সাংঘাতিক খবর মামা!

বক বলল, শুধু কি সাংঘাতিক! এরই মধ্যে খবরটা পাশের খাল-বিল, ডোবা-নালা ও পুকুরে-পুকুরে রটে গেছে। মাছ, কাঁকড়া ও ব্যাঙদের তাদের আপনজনেরা বেশি পানির সরোবর ও নদীতে নিয়ে যাচ্ছে। কুমির, জলহস্তী ও কচ্ছপেরা নিজেরাই চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সরোবরের মাছদের তো কেউ নিতে আসছে না। এজন্যই আমার যত দুঃখ। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না তোদের অবস্থা কী হবে। এত দিন এক সঙ্গে মিলেমিশে ছিলাম! ও হো-হো-হো।

কাঁকড়া খবরটা শুনে নিজেই ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। সে বককে আর কী সান্ত্বনা দেবে! তাই সে ছুটে গিয়ে অন্য কাঁকড়াদের, কাঁকড়ারা অন্য মাছদের, মাছেরা ব্যাঙ-ট্যাঙদের খবরটা প্রচার করে দিল। শুনে মাছ, কাঁকড়া ও ব্যাঙেরা মিলে বকের কাছে এসে বলল, মামা, আমাদের তাহলে উপায় কী, আমরা কী করে বাঁচব?

বক তখন তার চোখের কোণগুলো দু' দিকের পালকে ভালো করে মুছে নিয়ে বলল, খবরটা তোরা সবাই জানতে পেরেছিস তাতে আমি একটু আশ্বস্ত হচ্ছি। শোন, তোদের বাঁচানোর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। কিন্তু আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, অতটা কি পেরে উঠব?

মাছেরা অমনি বলে উঠল, উপায়টা কি আগে বলো না, মামা!

বক তখন মাথাটা নেড়ে বলল, শোন তাহলে। একটু দূরেই একটা বড় সরোবর আছে। সেটা যেমন বড়, তেমনি গভীর, অনেক পানি তাতে, এ-কূল ও-কূল দেখা যায় না। বারো কেন ছত্রিশ বছর খরায়ও তার পানি শুকোবে না। আমি যদি প্রতিদিন দু'একবার করে তোদের নিয়ে সেখানে রেখে আসতে পারি তাহলে খরার দিন আসতে আসতে তোরা বেঁচে যাবি। আর খরা এলে তো তোদের সেখানে কোনো চিন্তাই নেই। আমার বয়স হয়েছে ঠিকই, তবুও ঠিক করেছি দিনে যে কয়বার পারি, যত জনকে পারি সেখানে রেখে আসব। তা করতে গিয়ে যদি আমার মরণও আসে তাও ভালো। তবুও চোখের সামনে তো তোদের সবাইকে একসঙ্গে মরতে দিতে পারি না।

বকের কথায় সবাই আশা পেল। কেউ অবিশ্বাসের কিছু দেখতে পেল না। মাছেরা জলচরদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল। তাই বাঁচার ইচ্ছেটাও তাদের বেশি। তারা সবার আগে কাকুতি-মিনতি শুরু করল। তারা বলতে লাগল, মামা, এই বিপদের দিনে তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। যে করে হোক তুমি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে শুরু করো।

ওরে বোকা কাঁকড়া, এখনো তুই বুঝতে পারিস নি? সরোবরটা রয়েছে আমার পেটে।

বক দেখল তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। একথাটাই সে শুনতে চাইছিল। তাই পরদিন থেকে সে তার খরা-পূর্ব ত্রাণ কাজ শুরু করল। কাজ বলতে অন্য সরোবরে নিয়ে যাবার নাম করে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে পাথরে আছড়ে মেরে সাবাড় করা। তারপর ফিরে এসে মিথ্যা গল্প ফেঁদে সকলকে শোনাতে লাগল।

এভাবে দিন চলতে লাগল। এখন বুড়ো বকের আর খাদ্যের অভাব রইল না। খেয়ে-দেয়ে সে দিব্যি সুখে আছে। সরোবরের মাছেরা তার বুদ্ধি টের করতে পারল না।

বক প্রথম থেকেই মাছদের নিয়ে যেতে লাগল। একদিন সেই কাঁকড়াটা এসে বককে খুব দুঃখ করে বলল, মামা, তোমাদের সঙ্গে আমারই প্রথম কথা হল, অথচ তুমি শুধু মাছদেরই নিয়ে যাচ্ছ। আমার কথা ভুলেও মনে করছ না। একদিন ডেকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না। আজ আমাকে অন্য সরোবরে আগে নিয়ে যেতে হবে। তারপর অন্যদের নেবে।

একনাগাড়ে অনেক দিন ধরে মাছ খেতে খেতে বকের মুখেও কেমন যেন অরুচি এসে গেছে। কাঁকড়ার কথা শুনে ভাবল, এবার একটু মুখ বদল করি। সে কাঁকড়াকে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। কাঁকড়া তার দাঁড়া দিয়ে বকের গলা ধরে ঝুলে রইল।

যেতে যেতে যেখানে বক মাছদের এনে খেত সেই জায়গাটা কাঁকড়া উপর থেকে দেখতে পেল। বকটাও সেখানে আসতে আসতে নিচে নামতে লাগল।

কাঁকড়া তখন জানতে চাইল, মামা, সেই সরোবরটা আর কত দূরে?

বক ভাবল, কাঁকড়া তো পানির জীব, ডাঙায় তাকে কী ভয়! এই ভেবে ঠোঁট বাঁকা করে হেসে বলল, ওরে বোকা কাঁকড়া, এখনো তুই বুঝতে পারিস নি? সরোবরটা রয়েছে আমার পেটে। মিথ্যে গল্প বলে তোদের এখানে নিয়ে এসে খাচ্ছি। এ হল গিয়ে বুড়ো বয়সে প্রাণে বাঁচার ফন্দি। এবার তোর পালা।

বকের কথা শুনে কাঁকড়া আঁতকে উঠল। কিন্তু কর্তব্য ঠিক করতে এক মুহূর্তও দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে সে তার শক্ত দাঁড়া দিয়ে বকের নরম গলা চেপে ধরে তাকে মেরে ফেলল। তারপর দাঁড়া দিয়ে বকের গলাটা শরীর থেকে আলাদা করে সেটা নিয়ে আস্তে আস্তে নিজের সরোবরে ফিরে এল।

তাকে দেখে মাছ ও কাঁকড়ারা বলে উঠল, কী ব্যাপার! তুমি ফিরে এলে কেন? মামা তো আর এল না। আমরা তো তার আশায় বসে আছি।

কাঁকড়া বলল, আর বসে থাকতে হবে না। তোমাদেরও আর কোথাও যেতে হবে না। সে মিথ্যে গল্প ফেঁদে আমাদের সকলকে একে একে খেয়ে শেষ করতে বসেছিল। এতদিন মাছদের নিয়ে গিয়ে ওই কাছেই পাথরের উপর আছড়ে মেরে খেয়ে এখানে চলে আসত। নেহাৎ বুদ্ধি ও আয়ুর জোরে আমি বেঁচে গেছি। তার মতলবও ধরে ফেলেছি। এই দেখো বকের গলাটা নিয়ে এসেছি। আমার এই মোটা দাঁড়াগুলো আমাকে এবং তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমাদের আর ভয় নেই।

শেয়াল, চিতা ও কাকের প্রভুভক্তি

এক বলে ছিল এক সিংহ। তার নাম মদোৎকট। তার ছিল তিন অনুচর—এক চিতা, এক শেয়াল ও এক দাঁড়কাক। তারা সিংহের পাশে পাশে থাকে, ফাই-ফরমাশ খাটে, সিংহ তাদের খেতেও দেয়।

একদিন মদোৎকট অনুচরদের নিয়ে শিকারে চলল। এক জায়গায় গিয়ে দেখে একটি উট। সিংহ এমন অদ্ভুত প্রাণী আর কখনও দেখে নি।

তাই সিংহ থমকে দাঁড়িয়ে অনুচরদের বলল, পশুটাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো? বুনো নাকি পোষা তাও বুঝতে পারছি না। তোমরা খোঁজ-খবর নাও তো হে।

কাক বলল, মহারাজ, ওটা হল উট। মানুষেরা এই জন্তু পোষে, মরুভূমিতে তার জুড়ি জন্তু নেই। তবে আপনার আহারের উপযুক্ত, মারুন না!

সিংহ গম্ভীর গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ, এমন কথা মুখেও এনো না। শত্রুও যদি নিশ্চিন্ত মনে কারও ঘরে এসে ওঠে তাকে মারতে নেই। ওই দেখো সে নির্ভয়ে এসে পড়েছে। তোমরা গিয়ে তাকে অভয় দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। তার নাম-ধাম ও পরিচয় জানা যাক। যাও।

পশুরাজের আদেশ পেয়ে চিতা, শেয়াল ও কাক তার কাছে গেল। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সিংহের কাছে নিয়ে এল।

উট সামনে এসে পশুরাজকে অভিবাদন জানাল। পশুরাজ তার পরিচয় জানতে চাইল।

উট বলল, মহারাজ, আমি হলাম ক্রমেলক। আমার মনিব হল এক বণিক। বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আমি দলছাড়া হয়ে গেছি। বন থেকে পথ চিনে বের হতে পারছি না। এখন কী করি!

মদোৎকট বলল, কাজ কী আর মনিবের কাছে গিয়ে। সেই তো বোঝা টানতে হবে। তার চেয়ে আমার এই বনেই থেকে যাও। তোমার মতো আর কোনো কেউ যদিও নেই আমরা তো আছি। এখানে পান্নার মতো সবুজ ঘাস।

মরুভূমির মতো কাঁটা ঘাস খেয়ে মুখ রক্তারক্তি হবে না। কেউ তোমার ক্ষতিও করবে না।

স্বয়ং পশুরাজের অভয় পেয়ে ক্রমেলক সেখানে রয়ে গেল। খায়-দায়, মনের আনন্দে সবার সঙ্গে গল্প-গুজব করে। ঘুমুবার সময় ঘুমোয়। বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগল।

একদিন হল কী, মস্ত বড় এক বুনো দাঁতাল হাতির সঙ্গে লড়াই করে মদোৎকট আহত হল। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেলেও হাতির দাঁতে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সে ফিরে এসে গুহায় বিছানা নিল।

দু' দিন তিন দিন যায় মদোৎকট আর শিকারে বের হতে পারে না। তাই তার অনুচরদেরও ভালো খাবার জোটে না, উপোস করে সবার দিন কাটতে লাগল। খিদেয় সবাই জেরবার।

মদোৎকট অনুচরদের ডেকে বলল, আমি তো এখন একটু নড়তে চড়তে পারছি। কাছাকাছি কোনো জন্তু-টন্তু খুঁজে বের করো, শিকার করি, পেট তো আর মানে না।

প্রচণ্ড খিদেয় চিতা, শেয়াল ও কাকের অবস্থাও কাহিল। পশুরাজের হুকুম পেয়ে তাদের ছুটতে হল। চলল শিকার খোঁজা। কিন্তু ধারে-কাছে কোনো শিকার তারা পেল না।

তখন ধূর্ত শেয়াল দুই সঙ্গীকে ডেকে বলল, খামোকা খুঁজে আর কাজ নেই। ক্রমেলক আমাদের সামনেই রয়েছে। সে খেয়ে-দেয়ে মোটাও হয়েছে। তাকে মেরেই তো আমাদের খিদে মেটে। কয়েকটা দিন দিব্যি নিশ্চিন্ত।

কাক বলল, বলছ কী! স্বয়ং মহারাজ তাকে অভয় দিয়ে রেখেছেন।

শেয়াল হল ধূর্তের শিরোমণি। সে বলল, শোনো তাহলে, আমি যেমন করে পারি তাকে রাজি করাব। বুদ্ধিতে সব হয়। তোমরা ক্রমেলককে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করো। আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলে আসি।

চিতাও অনেক ভেবে সায় দিল। তখন শেয়াল দৌড়ে চলে গেল মদোৎকটের কাছে। গিয়ে বলল, মহারাজ আজও আপনার পথ্য করা হল না। কোনো জন্তু-টন্তু খুঁজে পেলাম না। আমাদেরও শক্তি প্রায় শেষ।

মদোৎকট বলল, তা কী আর করা! আজও সকলকে না খেয়েই থাকতে হল। কাল নিশ্চয়ই কিছু একটা জুটবে।

শেয়াল বলল, এভাবে আর কত দিন কষ্ট করবেন। বলছিলাম কী, আজকের আপনার পথ্যটা ক্রমেলকের মাংস দিয়েই হতে পারে।

শেয়ালের কথা শুনে মদোৎকট গর্জে উঠল, ওরে শয়তান, নীচ, তোর আস্পর্দা তো কম নয়। ফের একথা মুখে আনবি তো তোকেই শেষ করে আগে খাব। ক্রমেলককে আমি আশ্রয় দিয়েছি, অভয় দিয়েছি। আশ্রিতকে মেরে তুই আমাকে পাপী হতে বলছিস? এজন্যই মানুষেরা তোকে অপছন্দ করে।

সিংহ বলল, তোমরা গিয়ে তাকে অভয় দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।

শেয়াল দু' হাত জোড় করে বলল, আমি জানি মহারাজ। আশ্রিতজনকে মারা অন্যায়। কিন্তু ক্রমেলক যদি নিজে রাজি হয় তাহলে মারবেন। নয়তো আমাদের একজনকে মেরে খাবেন। এভাবে দিনে দিনে আপনার দুর্বল হয়ে পড়া উচিত নয়, শেষে যদি একটা অঘটন ঘটে যায়, তাহলে আমাদের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আপনি বাঁচলে তবেই তো আমাদের বাঁচা। আপনি যে রাজা!

এবার মদোৎকট একটু চিন্তায় পড়ল। শেষে বলল, কথাটা ঠিকই বলেছ। তাহলে দেখো কী হয়।

অমনি শেয়াল ছুটল সঙ্গীদের কাছে। তারপর সকলকে বলল, শিগ্‌গির চলো, খিদে-রোগে মহারাজের শেষ অবস্থা। তিনি না থাকলে কে আমাদের রক্ষা করবেন, অভয় দেবেন। চলো চলো, তাঁকে আমরা আমাদের শরীর দান করব, এই করে তাঁকে বাঁচাতে হবে। রাজা বাঁচলে তবে তো প্রজা ও রাজ্য।

শেয়ালের কথা শুনে সবাই চলল। পশুরাজের সামনে গিয়ে ছলছল চোখে তাকে ঘিরে বসল।

মদোৎকট বলল, কী খবর, শিকারের খোঁজ কিছু পেলে?

সবার আগে দাঁড়কাক হাত জোড় করে বলল, খুব খারাপ খবর মহারাজ, কোনো শিকারের হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু মহারাজের তো পথ্যের দরকার, আমাকে খেয়েই আজ প্রাণ ধারণ করুন। আপনার কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।

শেয়াল এগিয়ে এসে বলল, ওরে কাক, ধন্যি তোমাকে। অনেক প্রভুভক্তি তুমি দেখিয়েছ। তোমার এতটুকু মাংসে মহারাজের কী হবে! পেটের আগুন তো আরও বাড়বে মাত্র। এই বলে সে ভক্তি ভরে মহারাজকে বলল, প্রভু আমার, আজ আমাকে খেয়ে জীবন ধারণ করুন। এতে আমার জীবন ধন্য হবে।

শেয়ালের কথা শেষ হতে না হতেই চিতার ভক্তি উথলে উঠল। সে বলল, না মহারাজ, আজ আমাকে খেয়েই জীবন ধারণ করুন। এতে আমার জীবন ধন্য হবে। এতে আর কোনো কিন্তু করবেন না।

ক্রমেলক এতক্ষণ সবার কথা শুনছিল। সে ধূর্ত সঙ্গীদের মতলব ও ফন্দি একটুও বুঝতে পারে নি। তাই সে ভাবল, প্রভুভক্তি দেখিয়ে এরা তো দেখছি সবাই বাহবা পাচ্ছে। ওরা মরতেও চাইছে। কিন্তু মহারাজ এদের মারছেও না। আমিও তো তাহলে ওদের মতো কিছু বলতে পারি। পশুরাজ তো এতদিন আমাকে না মেরে রক্ষা করেছেন।

এই ভেবে সে এগিয়ে এসে বলল, ভাই চিতা, তুমি মহারাজের মতো নোখ দিয়ে শিকার করো, তোমরা একই গোত্রের। মহারাজ কী করে তোমাকে খাবেন?

তারপর সিংহের সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে ক্রমেলক বলল, মহারাজ, এরা কেউ আপনার আহারের যোগ্য নয়। শেয়ালও মাংসাশী। কাককে খেয়ে কোনো লাভ নেই। আমাকে খেয়েই আজ আপনি প্রাণ ধারণ করুন। এতে আমার জীবন ধন্য হবে। আপনি আর কোনো কিন্তু...

তার কথা শেষ হবার আগেই দু' দিক থেকে চিতা ও শেয়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পেট চিরে ফেলল। তারপর আর কী! মদোৎকটসহ সবাই তাকে খেয়ে শেষ করল।

সিংহ, শেয়াল, নেকড়ে ও উট

আর এক বনে থাকত এক সিংহ। তার দাঁত ছিল বজ্রের মতো সাংঘাতিক। তাই নাম ছিল বজ্রদাঁত। তার ছিল এক চালাক চাকর শেয়াল, তাই তার নাম ছিল চতুরক। অন্য চাকর নেকড়ে, তার ছিল খালি খাই খাই স্বভাব। এজন্য তার নাম ছিল মাংসমুখ।

দুই চাকর সিংহের বশংবদ, ফাইফরমাশ খাটে আর সিংহের এঁটো খেয়ে আনন্দে দিন কাটায়।

বজ্রদাঁত একদিন শিকার করে একটি মাদী উট মারল। মাদী উটের পেটে ছিল বাচ্চা। বজ্রদাঁত যখন তার পেট চিরল তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি জ্যান্ত নাদুস-নুদুস বাচ্চা। বাচ্চাটার উপর বজ্রদাঁতের মায়া পড়ে গেল। সে বাচ্চাটাকে ঘরে নিয়ে এল। আদর-যত্ন করে পুষতে লাগল। বাচ্চাটার কান দুটি ছিল ছুঁচলো, তাই তার নাম রাখল শঙ্কুকর্ণ। সিংহ বাচ্চাটাকে বলল, আমার কাছে তুমি নির্ভয়ে থাকো বনের কোনো পশু তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

শঙ্কুকর্ণ সিংহের কথায় রয়ে গেল। মনের আনন্দে বনের কচি ঘাস খেয়ে দিনে দিনে বড় হতে লাগল।

বজ্রদাঁত একদিন এক বুনো দাঁতাল হাতির সঙ্গে লড়াই করে খুব কাহিল হয়ে পড়ল। হাতির দাঁতের আঘাতে চার দিন শুয়ে শুয়ে কাটাল। তারপর উঠেই খিদের চোটে অনুচরদের বলল, দেখো তো কোথাও শিকার-টিকার পাওয়া যায় কি না! তাহলে খেয়ে বাঁচতে পারি। খিদেয় পেটে আগুন জ্বলছে।

তিন জনে মিলে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আশেপাশে কোনো শিকার মিলল না। হতাশ হয়ে বসে পড়ল এক জায়গায়।

এদিকে চতুরক শঙ্কুকর্ণকে নিয়ে ভাবতে লাগল। তাকে মারতে পারলে তিনজনের ভালোই হবে ভোজটা। কিন্তু বজ্রদাঁত তো তাকে ভালোবাসে আর অভয় দিয়েছে। সে কিছুতেই তাকে মারতে রাজি হবে না।

কিন্তু চতুরক ফন্দি-ফিকির খুঁজতে লাগল। তার কি বুদ্ধির অভাব আছে? সে তখন শঙ্কুকর্ণকে এক দিকে ডেকে নিয়ে বলল, ভাই শঙ্কুকর্ণ, খিদের জ্বালায় তো পশুরাজ ছটফট করছেন। তিনি না বাঁচলে তো আমাদের মরণ। তার প্রাণরক্ষার একটা বিহিত-ব্যবস্থা তো করতে হয়।

শঙ্কুকর্ণ বলল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বলো কী করতে হবে। প্রভুর মঙ্গলের জন্য আমি জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। তাতে এক কাজে এক শ' পুণ্য হয়ে যাবে।

চতুরক বলল, তাহলে শোনো, এই সুযোগে পুণ্য করে তোমার শরীরটাকে দ্বিগুণ করে নাও।

শঙ্কুকর্ণ বলল, তাহলে তো খুব ভালো হয়। বলো, আমাকে কী করতে হবে? তুমি যা বলবে আমি তা করব।

চতুরক বলল, তোমার শরীরটা মহারাজকে দিয়ে দাও। তাহলে তার জীবন বাঁচবে, তুমিও দ্বিগুণ শরীর পেয়ে যাবে।

শঙ্কুকর্ণ বলল, আমি এক্ষুণি রাজি। প্রভুর যাতে ভালো হয় তা-ই আমি চাই। আমার ইচ্ছের কথা প্রভুকে বলে দাও।

সব ঠিকঠাক করে চতুরক সকলকে নিয়ে বজ্রদাঁতের কাছে উপস্থিত হল। চতুরক দু' হাত জোড় করে বলল, প্রভু একটা জন্তুও পেলাম না। এদিকে দিনও শেষ হয়ে এল। এখন একটাই পথ আছে।

বজ্রদাঁত বলল, কী সেটা?

চতুরক বলল, আপনি যদি দ্বিগুণ শরীর ফিরিয়ে দেন তাহলে আমাদের শঙ্কুকর্ণ বলছে তার শরীর আপনাকে দেবে।

সিংহ খিদের জ্বালায় চতুরকের কথার মারপ্যাঁচ অত কিছু ভাবল না। সে অমনি বলল, সেটা আর এমন কী আমার জন্য! ওর শরীরের দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেওয়া তো কিছুই নয়। ঠিক আছে শঙ্কুকর্ণ দ্বিগুণ শরীরই পাবে।

বজ্রদাঁতের মুখ থেকে কথা শেষ হতে না হতেই শেয়াল ও নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্কুকর্ণের উপর। তার পেট চিরে ফেলল। সে মারা গেল।

বজ্রদাঁত বলল, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তোরা তো জানিস মাংস খাওয়ার আগে আমাকে পানি খেতে হয়। আমি যতক্ষণ না আসি তোরা সাবধানে পাহারা দিস।

সিংহ চলে যেতেই চতুরকের মাথায় অন্য এক বুদ্ধি এসে গেল। শঙ্কুকর্ণকে একা কী করে খাওয়া যায় সেই মতলব ভাজতে লাগল। অমন নাদুস-নুদুসকে তার একার চাই।

একটু পরে সে চিতাকে ডেকে বলল, ওরে মাংসমুখ, তুই তো দেখছি খিদেয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিস না। এক কাজ কর, প্রভু ফিরে আসার আগে খানিকটা মাংস চটপট খেয়ে নে। আমি প্রভুকে বুঝিয়ে বলব না হয়। এতে তিনি কিছু মনে করবেন না।

মাংসমুখও তাই ভাবছিল। ভরসা পেয়ে সে শঙ্কুকর্ণের বুকের মাংসে কামড় বসাল। কিন্তু এক টুকরো খেয়েছেদ কী খায় নি, অমনি চতুরক ফিসফিস করে বলল, সর্বনাশ হয়েছে মহারাজ আসছেন। তুই শিগ্‌গির ওপাশটায় সরে যায়। তাহলে তুই খেয়েছিস বলে সন্দেহ করতে পারবেন না।

তাই করল মাংসমুখ। শঙ্কুকর্ণের ওদিকে মাথা নিচু করে বসে রইল সে। আর সিংহ এসে দেখে শঙ্কুকর্ণের কলজেটা হাওয়া। সিংহ তখন রেগে চিৎকার করে উঠল, কে আমার আগে খেল কলজেটা? আমি তাকেই আগে শেষ করব।

বেচারী মাংসমুখ তো উটের আড়ালে মাথা গুঁজে ছিল। সে মাথা তুলে চতুরকের দিকে তাকাতে লাগল। তার সঙ্গে তো কথাই হয়েছে চতুরক মহারাজকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলবে।

চতুরক তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তখন এত করে মানা করলাম কানে শুনলে না, মাংস খেলি। এখন আমার মুখের দিকে তাকালে কী হবে? যেমন কম্ম তেমন ফল হোক।

একথা শুনে মাংসমুখ এক লাফ মেরে দিল দৌড়, পিছন ফিরে আর তাকালই না। বজ্রদাঁতের মুখে পড়ার ইচ্ছে তার নেই।

চতুরক বাঁকা হেসে ভাবল, একটাকে তো তাড়ানো গেল। এখন দেখি সিংহটাকে কী করা যায়!

ঠিক সে সময় এক দল বণিক উটের সারির পিঠে সওদা নিয়ে সেদিকে আসছে। সবার সামনের উটের গলায় বাঁধা আছে এক ঘণ্টা। ঢং ঢং করে সেটা বাজছে। সেই ঘণ্টার বিকট শব্দ শুনে বজ্রদাঁত ভাবল, এ আবার কোন উৎপাত!

সিংহ বলল, ওহে চতুরক, দেখ তো শব্দটা কিসের? আগে তো কখনো এমন শব্দ শুনি নি?

চতুরক বনের মধ্যে একটু গিয়ে আবার ফিরে এল। সে বলল, মহারাজ সর্বনাশ হয়েছে। শিগ্‌গির পালান। এক পাল উট নিয়ে স্বয়ং ধর্মরাজ আসছেন। মরা উটটার আত্মীয়-স্বজনদেরও দেখলাম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সঙ্গে আছে। তারা প্রতিশোধ নেবার জন্যই মনে হয় দল বেঁধে আসছে। এই এসে পড়ল বলে। এখন না পালালে শেষে প্রাণ দিতে হবে।

এ কথা শুনে, আর একটুও সময় নষ্ট না করে বজ্রদাঁত মুখের খাবার ফেলে লেজ তুলে দৌড়। বনের কোথায় উধাও হয়ে গেছে তা আর দেখা গেল না।

এবার চতুরকের বুদ্ধির জয় হল। সে মনের সুখে একটু একটু করে মাংস খাওয়া শুরু করল।

পঞ্চতন্ত্রের বচন

১. অশুভ চিন্তাই হল দুর্দৈব। দুর্দৈব যখন মানুষকে ভয় করে তখন সেই মানুষ শত্রুকে বন্ধু করে, বন্ধুকে ঘৃণা করে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে। ভালোকে মনে করে মন্দ। মন্দ মানুষকে মনে করে ভালো।

২. মানহীন ব্যক্তি সেখানে মান পায় আর মানী পায় অপমান, সেখানে যা ঘটে তা হল দুর্ভিক্ষ বা অনটন। মৃত্যু ও ভয়।

৩. চোরও যদি উপকারে আসে তার মঙ্গল চিন্তা করতে হয়।

৪. স্থান, কাল, পাত্র ও পরিণাম চিন্তা করে কথা বলতে হয়। এসব না বুঝে যদি কেউ ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নিজের পক্ষেও অসম্মানজনক কোনো কথা বলে, তবে সে কথা বিষের মতো কাজ করে।

৫. একজনকে ত্যাগ করেও যদি পরিবার বা বংশের স্বার্থ রক্ষা পায় তবে তা করা মঙ্গলকর। পরিবার বা বংশকে ত্যাগ করে গ্রামের স্বার্থরক্ষা করতে হয়। গ্রামকে ত্যাগ করতে হয় দেশের কল্যাণে। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে হয় সবকিছুর বিনিময়ে।

৬. পণ্ডিত, মূর্খ, অপ্রিয় বা প্রিয়জন যে-ই অতিথি হয়ে আসুক তাকে কখনো অনাদর বা অবহেলা করতে নেই।

৭. অনবরত পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় অতি বড় প্রতিভাবানেরও প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়।

৮. ধনবান, বিদ্বান ও উচ্চবংশীয় হলেও গুণগ্রাহী না হলে ভৃত্যরাও তার বাধ্য থাকে না।

৯. প্রভুর মন ও মর্জি বুঝে মন যুগিয়ে চললে রাক্ষসদেরও বশ করা যায়।

১০. অনেকে মিলে কথা বলতে বলতে কথার পিঠে কথা এসে যায়। যেমন সুবৃষ্টির গুণে একটা বীজ থেকে গাছ হয়ে অনেক বীজ জন্মায়।

১১. রাজা যাদের পছন্দ করে না, তাদের যারা পছন্দ করে, রাজা তাদেরও অপছন্দ করে। আর রাজা যাদের পছন্দ করে, তাদের প্রিয় কাজ যে ব্যক্তি করে, সেও রাজার প্রিয় হয়।

১২. পণ্ডিত ব্যক্তি কোনো কাজ না পেয়ে খিদেয় শুকিয়ে অচল হতে বসলেও বিবেক-বিবেচনাহীন লোকের চাকরি তিনি করতে যাবেন না।

মিত্রপ্রাপ্তি

বন্ধুত্ব লাভ হল মিত্রপ্রাপ্তি। প্রকৃত বন্ধু পাওয়া খুব কঠিন। প্রকৃত বন্ধুকে এজন্য বলা হয় জীবনের সম্পদ। সুখে ও দুঃখে, আপদে ও বিপদে, এই মিত্র পরম সহায়। বন্ধুত্ব লাভ করা যেমন সহজ নয়, বন্ধুত্ব রক্ষাও তেমনি কঠিন। আর বন্ধু হয়ে উঠতে জানা চাই, এই ব্যবহার যারা জানে তারা সত্যিকার ভাগ্যবান। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর দায়িত্ব ও কর্তব্য, দাবি ও অধিকার এসব বিষয় নিয়েই এই মিত্রপ্রাপ্তি।

'লঘুপতন ও তার বন্ধুরা' গল্পে দেখা যায় এক কাক লঘুপতন, এক হরিণ চিত্ররূপ, এক ইঁদুর হিরণমুখ ও এক কচ্ছপ মন্থর কীভাবে মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হল তার কাহিনী। এই দীর্ঘ গল্পে শত্রুকে কীভাবে পরাস্ত করতে হয়, আবার শত্রুর হাতে কীভাবে হিরণমুখ শেষ পর্যন্ত হেরে গেল তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

লঘুপতন ও তার বন্ধুরা

মহিলারোপ্য নগরের প্রান্তে ছিল পুরনো এক বটগাছ। সেখানে থাকত নানা পাখি, পোকামাকড়, কাঠবেড়ালি। আর ছিল দাঁড়কাক। তার নাম লঘুপতন। তিন কুলে তার কেউ ছিল না। গাছের পাখিরাই তার আপনজন, ভাব-ভালোবাসা ছিল সবার সঙ্গে। অন্যের বিপদে-আপদে সবার আগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

প্রতিদিন সকালে সে শহরে চলে যেত খাবার খেতে। সারাদিন থেকে সন্ধের আগে সেই বটগাছে ফিরে আসত। একদিন সকালে সে শহরের দিকে রওনা দিয়েছে। এমন সময় সে দেখল দাড়ি-গোঁফ ভরা ঝাঁকড়া-চুলো যমদূতের মতো এক ব্যাধ কাঁধে জাল নিয়ে বাটগাছের দিকে আসছে।

লঘুপতন সঙ্গে সঙ্গে ফিরল। শহরে আর যাওয়া হল না। বটগাছে ফিরে এসে ডাকাডাকি করে সকলকে বিপদের কথা জানিয়ে দিল। বলল, ভাইসব, শয়তান ব্যাধ পাখিদের ধরার জন্য জাল নিয়ে আসছে। জাল পেতে চাল ছড়িয়ে দিয়ে সে ফাঁদ পাতবে। তোমরা কেউ ভুলেও সেই চাল খেতে যেও না। তাহলেই জালে আটকে যাবে। এখন চুপ করে সবাই যে-যার জায়গায় বসে থাকো। টুঁ শব্দটিও করবে না।

বটের বাসিন্দরা সবাই লঘুপতনকে ভালোবাসে। তার সাবধানবাণী সবাই শুনল। সবাই পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। চারদিক হয়ে গেল নীরব-নিঝুম।

ব্যাধ এসে জাল পাতল, নিসিন্দা ফুলের মতো সাদা চাল ছড়িয়ে দিল সেখানে। তারপর একটু দূরে গিয়ে ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। পাখিরা গাছের ওপর থেকে সব দেখল। কিন্তু কেউ ফাঁদে পা দিল না। ফাঁদ ও চাল যেমনকার তেমন পড়ে রইল।

এ সময় পায়রাদের রাজা চিত্ররূপ তার হাজার অনুচর নিয়ে সেই পথে উড়ে যাচ্ছিল। গাছের নিচে নিসিন্দা ফুলের মতো ধবধবে চাল তারা ওপর থেকে দেখতে পেল। অমনি তারা শন শন শব্দ করে নামতে লাগল।

লঘুপতন পাতার আড়াল থেকে পায়রার ঝাঁক নামতে দেখে আঁতকে উঠল। সে বুঝতে পারল পায়রাদের বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। চাল খেতে নামলেই বিপদ। সে

অমনি উড়ে গিয়ে পায়রাদের রাজা চিত্ররূপকে সব খুলে বলল। কিন্তু চিত্ররূপ তার কথা কানে তুলল না। কয়েকটা পায়রা তো তাকে এজন্যে গালমন্দই করে বসল।

ব্যাস্, চাল খাওয়ার লোভে পায়রারা সেখানে নেমে পড়ল, আর অমনি পায়ের সঙ্গে জাল আটকে গেল। তারা যত পা খুলতে চেষ্টা করে বেশি জড়িয়ে যায়। তাদের অসহায় ছটফটানি দেখে লঘুপতনের বুক ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু তার বারণ তো তারা শুনল না। এদিকে চিত্ররূপও হায় হায় করতে লাগল। তবে সে তো দলের রাজা। তাই এই ঘোর বিপদেও সাহস হারাল না।

চিত্ররূপ পায়রাদের ডেকে বলল, শোনো ভাইসব, উপকারী বন্ধু লঘুপতনের কথা না শুনে আমরা বিপদে পড়েছি, বুদ্ধি খাটিয়ে এখন উদ্ধারও পেতে হবে। তোমরা সবাই এক সঙ্গে প্রাণপণে ডানা মেলে জালিসুদ্ধ নিয়ে উড়াল দাও। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

পায়রার ঝাঁক আটকে পড়ায় ব্যাধের খুব আনন্দ হল। সে অমনি জাল গুটিয়ে নিতে ঝোপ থেকে বের হতেই দেখে এই আশ্চর্য কাণ্ড। তার ব্যাধ জীবনে এমন ঘটনা দেখে নি, শোনেও নি। সে হইহই চিৎকার করে জালের পেছন পেছন ছুটল। কিন্তু আকাশের পায়রাদের নাগাল পাওয়া কি সম্ভব? কিছু দূর গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পেল না। পায়রারা আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নগর থেকে কিছু দূরে ফুল ও ফলের বাগান ঘেরা এক প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের ঢিবিতে সুড়ঙ্গ করে থাকে ইঁদুরের রাজা হিরণমুখ। তার সঙ্গে পায়রারাজ চিত্ররূপের অনেক দিন থেকে বন্ধুত্ব। আকাশপথে উড়ে এসে চিত্ররূপ জাল নিয়ে নামল হিরণমুখের সুড়ঙ্গ-দুর্গের কাছে।

এদিকে লঘুপতন চিত্ররূপের বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হল। সে তখন খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে জালের পিছে পিছে ছুটল। তার কৌতূহল হল পায়রারা কী করে দেখা। চিত্ররূপ দলবল নিয়ে নামল, আর লঘুপতনও তার পাশের এক পিয়াল গাছে গিয়ে বসল। ঝটপট সে কয়েকটা পিয়াল ফল খেয়ে কোমর শক্ত করে নিল।

হিরণমুখের দুর্গের মুখে পৌঁছে চিত্ররূপ বন্ধুকে ডেকে বলল, বন্ধু হিরণমুখ, ঘরে আছ? আমি চিত্ররূপ। আমার এখন ভীষণ বিপদ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো।

ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হিরণমুখ বের হল না। গর্তের মুখ থেকে আগে সব দেখে নিল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে তার সুড়ঙ্গ-দুর্গের বাইরে এল। বন্ধুকে চিনতে পেরে এবং দলবলসহ বিপদে পড়েছে দেখে তার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

হিরণমুখ বলল, কী করে এই বিপদে পড়লে?

চিত্ররূপ বলল, আর বলো না ভাই, লোভ করেছিলাম, তার ফল ভোগ করছি। এখন তুমি জাল কেটে আগে উদ্ধার করো।

হিরণমুখ তাড়াতাড়ি চিত্ররূপের কাছে গিয়ে জালে দাঁত বসাল। অমনি চিত্ররূপ বলে উঠল, না ভাই, আগে আমার প্রজাদের উদ্ধার করো, তারপর আমাকে।

শুনে হিরণমুখ বলল, সে কী! তুমি হলে রাজা, তার উপর আমার বন্ধু। তোমাকেই তো আগে মুক্ত করা উচিত।

চিত্ররূপ বলল, ভাই, একথা বলো না। এরা সবাই আমার অনুগত। এদের রক্ষা করতে না পারলে অধর্ম হবে। আমার পায়ের জাল কাটতে কাটতে ধরো যদি তোমার দাঁত ভেঙে যায়? তারপর আবার তোমার দলবলদের ডাকা, এদিকে ব্যাধ বা অন্য কোনো দুষ্ট লোক যদি এসে পড়ে তখন উপায় কী হবে! আগে তুমি আমার প্রজাদের মুক্ত করো।

বন্ধুর কথায় হিরণমুখ খুব খুশি হল। বলল, রাজার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। কিছু মনে করো না, তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। এভাবে চললে তুমি আরও অনেক পায়রার রাজা হতে পারবে।

এই বলে হিরণমুখ তার ধারালো দাঁত দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব পায়রাকে মুক্ত করে দিল।

চিত্ররূপ বলল, বন্ধু, তুমি আমার প্রাণ-মান সব বাঁচালে। তোমার এই উপকারের কথা চিরকাল মনে থাকবে।

হিরণমুখ বলল, বিদায় বন্ধু, এবার তুমি তোমার ডেরায় ফিরে যাও। আবার কখনো যদি দরকার হয় আমার কাছে এসো। বিপদ-আপদ ছাড়াও আসবে বৈ কি! নইলে বন্ধুত্ব থাকবে কী করে!

এই বলে হিরণমুখ তার দুর্গে ঢুকে পড়ল। পায়রারাও চলে গেল। এদিকে পাতার আড়াল থেকে এত সব কাণ্ড দেখে লঘুপতন তাজ্জব। সে ভাবল বুদ্ধি ও শক্তির জোরে পায়রারা বেঁচে গেল। আবার বন্ধু ইঁদুরের সাহায্য পেল বলে পায়রারা জালের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। আমার তো আবার চঞ্চল স্বভাব, কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। তবে এই ইঁদুর হল যথার্থ ভালো। আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। একা একা থাকার চেয়ে একজন প্রকৃত বন্ধু থাকা খুব দরকার।

এই ভেবে সে গাছ থেকে নেমে ইঁদুরের গর্তের মুখে গিয়ে চিত্ররূপের মতো গলা করে বলল, বন্ধু হিরণমুখ ঘরে আছ?

ডাক শুনে হিরণমুখ চমকে উঠল। সে ভাবল, বোধ হয় কোনো পায়রার পায়ের বাঁধন কাটা হয় নি, তাই ডাকছে।

সদা সতর্ক ইঁদুর ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, কে হে তুমি?

লঘুপতন বলল, আমি দাঁড়কাক। আমার নাম লঘুপতন।

হিরণমুখ আঁতকে উঠল। গর্তের আরো একটু ভিতরে গিয়ে বলল, তুমি দূর হও, এখানে কী চাই?

লঘুপতন বলল, ভাই, এইমাত্র যা-সব দেখেছি তাতে আমি যেমন আশ্চর্য

হয়েছি তেমন ভয়ও পেয়েছি। তুমি পায়রাদের বাঁধন কেটে মুক্ত করেছ দেখলাম। তোমার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তাই ভাবছি, যদি আমি কোনো দিন ফাঁদে পড়ি তোমার কাছে এসে মুক্তি পেতে পারব। এজন্য তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলাম।

হিরণমুখ ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, তুমি চলে যাও এখান থেকে। সবলের সঙ্গে দুর্বলের, খাদ্যের সঙ্গে খাদকের কখনো বন্ধুত্ব হয় না। তোমার সঙ্গে আবার এত কথা কী! মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাকে খাওয়ার মতলব খুঁজছ?

লঘুপতন ব্যস্ত হয়ে বলল, না না হিরণমুখ, আমি তোমার ক্ষতি করার মতলব নিয়ে আসি নি। সত্যি বলছি, আমাকে বন্ধু করে নাও। তুমি যদি আমাকে বন্ধু করে না নাও তাহলে তোমার দুর্গের মুখে আমি এই বসলাম। এখানেই আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

হিরণমুখ বলল, কেন মিছিমিছি বকছ। জ্বালাতন করছ। তুমি হলে শত্রু, তোমার সঙ্গে কিসের ভরসায় আর কী বিশ্বাসে বন্ধুত্ব করব? আমি তো তোমার থেকে অনেক দুর্বল।

লঘুপতন বলল, তোমার সঙ্গে তো এখনো দেখাই হয় নি, শত্রুতা হল কী করে বলো তো!

তোমার সঙ্গে শত্রুতা আমার জন্মগত। জন্ম থেকেই তুমি আমি শত্রু। তা সবাই জানে। সাপ আর নেউলে, বাঘ আর মোষে, কুকুর আর শেয়ালে, আগুন আর পানিতে, সবল আর দুর্বলে শত্রুতা কোনোদিন যায় না।

এসব কথার কোনো মানে হয় না। কারণ ছাড়া বন্ধুত্বও হয় না, শত্রুতাও না। তাই বলছি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, আমরা যাতে একে অপরের উপকারে আসি। আর একেবারেই যদি বিশ্বাস না করে তুমি তোমার দুর্গে থেক, আমি বাইরে থাকব। এভাবেই আমরা কথাবার্তা বলব। গল্পসল্প করব। এছাড়া আর কী করা!

তখন হিরণমুখ ভাবল, কাকটা তো দেখি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছে। চলে যেতে বললেও যাচ্ছে না। কথাবার্তাও ভালো বলছে। তা দেখি ভাব করে!

এই ভেবে সে ডেকে বলল, এত করে যখন বলছ করলাম ভাব। তুমি ভুলেও কখনো আমার গর্তে উঁকি দেবে না, আমিও তোমার সামনে বের হব না।

আচ্ছা তাই হবে।

সেদিন থেকে ওরা দূর থেকে কথাবার্তা বলতে লাগল। দূরে দূরে থেকে নানা গল্প, সুখ-দুঃখের কথা শুরু করল। এভাবে গল্প করতে করতে কিছু দিনের মধ্যে দিব্যি বন্ধুত্ব জমে গেল। লঘুপতন ভুলে গেল পুরনো বটগাছের বন্ধুদের কথা। সেই বাগানে হিরণমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে থেকে গেল। সে এখন শহর থেকে বন্ধুর জন্য ঠোঁটে করে নানা রকম ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসে, যা হিরণমুখ আগে কখনো খায় নি। হিরণমুখ মন্দিরের ভাঁড়ারঘর থেকে ফলের টুকরো, চাল-ডালের

খুদ নিয়ে লঘুপতনকে দেয়। এভাবে তার মনের ভয়ও একদিন কেটে গেল। লঘুপতনের ডালার মধ্যে ঢুকে এখন সে দিব্যি গল্প করে। খেলা করে।

এভাবে দিন যায়। রাত আসে। আবার দিন কেটে যায়। একদিন লঘুপতন শহর থেকে ঘুরে এল মুখ ভার করে। কাঁদো কাঁদো গলায় সে বলল, না বন্ধু, এ দেশে আর থাকা যাবে না। এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যতে হবে।

হিরণমুখ অবাক হয়ে বলল, কেন কেন? চলে যাবে কেন?

এ দেশে আকাল নেমেছে। লোকে শুকিয়ে মরছে। পশু-পাখিদের খাবার দেয় না। তার ওপর লোকে পাখি ধরে খাবে বলে ঘরে ঘরে জাল পাতা শুরু করেছে। আজ তো আমি জালে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। নেহাৎ আয়ু ছিল বলে পালিয়ে আসতে পেরেছি। তাই বলছি এখানে থেকে বেঘোরে আর প্রাণ দেব না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। কী করি এখন?

হিরণমুখ অনেকক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, তা কোথায় যাবে শুনি?

লঘুপতন বলল, দক্ষিণ দেশে এক গভীর জঙ্গলের কাছে একটা বড় বিল আছে। সেখানে থাকে আমার ছেলেবেলার বন্ধু মন্থর। ভাবছি তার কাছেই গিয়ে থাকব। সে দু'-চার টুকরো মাছ-টাছ যা দেবে তাই খেয়ে তার সঙ্গে গল্প-গুজব করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। আমার আর কী, একা মানুষ। এখানে থেকে জালে পড়ে মরতে চাই না। আগে তো জীবন।

হিরণমুখ বলল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। এখানে আমারও বড় দুঃখ।

সে কী! তোমার আবার কিসের দুঃখ! তুমি তো এখানে দিব্যি সুখে আছ।

সে ভাই অনেক কথা। সেখানে গিয়ে সব কথা তোমাকে বলব। তাছাড়া তোমার মতো বন্ধু তো আর এখানে নেই। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

আমি তো যাব উড়ে, আকাশ-পথে। তুমি কী করে আমার সঙ্গে যাবে?

কেন তোমার পিঠে করে নিয়ে যাবে? এখানে আমার আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে নেই। তুমি ছাড়া আমার বাঁচা সম্ভব নয়।

তাহলে আর কী! তোমাকে পিঠে করে সেই বিলে নিয়ে যাব। আমরা তিন বন্ধুতে মিলে গল্প করে দিন সুখেই কাটবে।

পরদিন ভোর হতেই লঘুপতন হিরণমুখকে পিঠে নিয়ে উড়ে চলল সেই বিলের দিকে।

সেখানে ওরা পৌঁছল। সে এক গভীর বন। তার মাঝে প্রকাণ্ড এক বিল। উঁচু-উঁচু বট-পাকুড় ও তাল-তমালের গাছ। সেই বিলের ধারে বসে আছে আদ্যিকালের কচ্ছপ মন্থর। দিন শেষ হতে চলেছে। বিলের পানিতে নেমে ডুব দিয়ে তলায় চলে যাবে কি না ভাবছে। এমন সময় সে দেখতে পেল দূর আকাশে পাখা মেলে উড়ে আসছে একটি কাক। তার পিঠের ওপর আবার একটি ইঁদুর। সে অবাক হয়ে ভাবল, এতো ভারি অদ্ভুত! তারপর কী ভেবে তাড়াতাড়ি পানিতে নেমে দিল ডুব।

লঘুপতন উড়ে এসে বিলের ধারের এক নিমগাছে বসল। ইঁদুর বন্ধুকে গাছের এক কোটরে নামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, ওহে মন্থর, বন্ধু আমার, পানি থেকে উঠে এসো। আমি তোমার বন্ধু লঘুপতন।

ডাক শুনেই মন্থর চিনতে পারল। অনেক দিন পর বন্ধুকে দেখতে পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না। সে তাড়াতাড়ি কূলে উঠে হড় হড় করে বলে উঠল, এসো এসো বন্ধু, কতদিন পর দেখা। এতদিন তুমি আসছ না বলে আমার কত চিন্তা। তোমার দুটি পাখা আছে, যেখানে সেখানে যেতে পার। আমি তো পারি না। তারপর বলো, সব ভালো তো? তোমার গাঁও-গেরামের খবর বলো।

দু' জনের সে কী গলাগলি, আলিঙ্গন, অশ্রু বিসর্জন, হাসি আর কত কথা! এমন সময় হিরণমুখ গাছ থেকে নেমে মন্থরকে সম্ভাষণ জানিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল।

মন্থর তখন লঘুপতনের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই, এই ইঁদুরটি কে? এতো তোমার খাদ্য। কিন্তু দেখলাম তোমার পিঠে করে নিয়ে এসেছ। গুরুতর কারণ কিছু আছে নিশ্চয়ই! আমি তো ভাবছি ওটা খেয়েই আমার সঙ্গে কথা বলছ।

লঘু বলল, ভাই, এই ইঁদুর হল হিরণমুখ, আমার প্রাণের সখা। প্রাণের দায়ে সেও দেশ ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছে। এখন তুমিই আমাদের ভরসা।

মন্থর বলল, চলে এসেছ বেশ করেছ। আমার একজন বন্ধু বাড়ল। কিন্তু দেশ ছেড়ে আসার মতো তার কী ঘটেছে বলো তো?

লঘু বলল, জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিল অনেক কথা বলার আছে। এখানে এসেই বলবে। তাছাড়া আমাকে ছাড়া নাকি সে বাঁচবে না। তবে আসল কথা আমাকেও বলে নি। তা ভাই হিরণ, এবার তোমার দুঃখের কথা বলো। আমরা দু' জনে এক সঙ্গে শুনি।

হিরণমুখ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাহলে শোনো।

হিরণমুখ দুঃখের কাহিনী

শহর থেকে দূরে মন্দিরের বাগানে মাটির গর্তে ছিলাম ইঁদুরদের রাজা হয়ে। তা সুখেই ছিলাম। দাপটও ছিল কম না।

সেই মন্দিরে থাকতেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম তাম্রচূড়। প্রতিদিন শহরে গিয়ে ভিক্ষে করে ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসতেন। রাতে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়তি খাবার হাঁড়িতে করে দেয়ালের গায়ে একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়তো। সকালে সে সব খাবার ঝাড়ুদার-চাকরকে ডেকে খাইয়ে তাদের কাজে লাগিয়ে দিতেন। তারা মন্দির ঝাড়পোঁছ করে ঝকঝকে করে রাখত। এভাবেই চলছিল।

এক লাফে চড়ে বসলাম সেই হাঁড়িতে। দেখি কতরকম খাবার।

সন্ন্যাসীকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। মন্দিরের ভাঁড়ারের খাবার আর এখানে-ওখানে পড়ে থাকা খাবার খেয়ে আমার দিব্যি চলে যেত। সুখেই ছিলাম। একদিন আমার অনুচরেরা এসে বলল, সন্ন্যাসী মন্দিরে রান্না করা খাবার ঝুলিয়ে রাখে। তারা অনেক চেষ্টা করেও তার নাগাল পাচ্ছে না। আমি যদি তার কোনো বিহিত করি।

সেই রাতেই আমি দলবল নিয়ে হাজির হলাম সন্ন্যাসীর ঘরে। এক লাফে চড়ে বসলাম সেই হাঁড়িতে। দেখি কত রকমের খাবার। মনের আনন্দে তুলে তুলে সকলকে দিলাম, আমিও পেট ভরে খেলাম। এমনি করে রোজ সেই খাবার খাই। সন্ন্যাসী সাধ্যমতো চেষ্টা করেন পাহারা দেবার। একটা ফাটা বাঁশ বিছানার পাশে রাখেন। আমার ভয়ে শুয়ে শুয়েই বাঁশ দিয়ে মাটিতে শব্দ করেন। আমি ভয় পেয়েও

তক্কে তক্কে থাকতাম। শেষ রাতের দিকে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, আমি লাফ দিয়ে চড়ে বসতাম হাঁড়িতে। এমনি করে রোজ রাতে সন্ন্যাসী ও আমার মধ্যে লড়াই চলে। সবসময় আমি জিতে ভরপেট খেয়ে রাত শেষ হবার আগে ঘরে ফিরে আসতাম।

একদিন মন্দিরে এলেন এক অতিথি। তিনিও সন্ন্যাসী। তাম্রচূড়ের পুরনো বন্ধু। তাঁর নাম বাক্যচূড়। অনেক তীর্থ দেখে ঘুরতে ঘুরতে বন্ধুকে দেখতে এসেছেন। তাম্রচূড় সাধ্যমতো অতিথি আপ্যায়ন করলেন। তারপর রাতে দু' জনে কুপের বিছানায় শুয়ে গল্প শুরু করলেন।

বাক্যচূড় নানা তীর্থ ঘুরে এসেছেন! কত কিছু দেখেছেন। সে সব গল্প করতে লাগলেন। তাম্রচূড় শুনছেন কিন্তু কিছুই তাঁর কানের মধ্যে ঠিক ঠিক ঢুকছে না। তাঁর মন পড়ে আছে খাবারের হাঁড়িতে। এই বুঝি ইঁদুর এল। বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে হ্যাঁ হুঁ করছেন আর ফাটা বাঁশ দিয়ে মাটিতে শব্দ করছেন।

একটু পরেই বাক্যচূড় বুঝতে পারলেন তার কথার দিকে তাম্রচূড়ের মন নেই। এতে বাক্যচূড়ের খুব রাগ হল। তিনি বিছানায় উঠে বসে বললেন, দেখো তাম্রচূড়, বন্ধু মনে করে তোমার কাছে এসেছি। এখন দেখছি আমার ভুলই হয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে খুশি মনে কথা বলছ না। একটা মন্দির করেছ বলে এত অহংকার? ঠিক আছে, এখনই আমি চললাম, এই রাতেই।

শুনে তাম্রচূড় বন্ধুর হাত ধরে মিনতি করে বললেন, ভাই, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। একটু শান্ত হও, তারপর বলছি কেন আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি।

বন্ধুকে পাশে বসিয়ে তাম্রচূড় বলতে লাগলেন, একটা ইঁদুর আমাকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। খাবারের হাঁড়ি এতো উপরে ঝুলিয়ে রেখেও তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না। একটু চোখ বুজলেই বদমাশটা লাফিয়ে উঠে তাতে চড়ে বসে সব খাবার শেষ করে দেয়। মন্দিরের কাজের লোকদের ভালো-মন্দ খেতে দিতে পারছি না। তারাও কাজে মন লাগাচ্ছে না। তাই ওই ইঁদুরকে ভয় দেখানোর জন্য ফাটা বাঁশ দিয়ে বারবার মাটিতে শব্দ করছি। তুমিও আমাকে অমনোযোগী ভাবছ। কী করব, ইঁদুরটা এমন লাফায় যে বেড়াল বা বানরও সে-রকম পারে না।

শুনে বাক্যচূড় একটু শান্ত হলেন। তারপর বললেন, তাহলে বলতে হয় ইঁদুরটা দুর্দান্ত। সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। এর ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। কাল সকালে তার গর্তটা আমাকে দেখিয়ে দিও। দেখি কী করতে পারি।

তাম্রচূড় বললেন, গর্ত কোথায় তা তো খুঁজে দেখি নি। তা গর্তে কী খুঁজবে বলো?

বাক্যচূড় বললেন, দেখো, সব গেরস্ত বাড়িতেই কম-বেশি ইঁদুরের উৎপাত আছে। কিন্তু তোমার ঘরের ইঁদুরটার লাফ-ঝাঁপ একটু মাত্রা ছাড়ানো। এর পেছনে কোনো কারণ না থেকে পারে না। আমার নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনার কথা বলি শোনো।

বাক্যচূড় শুরু করলেন। একবার ঘুরতে ঘুরতে এক রাতে এক বামুনের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। পরদিন পৌষ সংক্রান্তি। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনলাম বামুন ও বামনি কথাবার্তা বলছে।

বামুন বলছেন, আজ সংক্রান্তি। লোকে অনেক দানধর্ম করবে। আমি দান নিতে পাশের গ্রামে যাচ্ছি। বাড়িতে অতিথি আছে, তুমি তাঁর সেবা-যত্ন করো।

শুনে বামনি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, বলতে তোমার লজ্জা করে না! অতিথি সেবা কী দিয়ে করব? ঘরে এক মুঠো চালও নেই, সে খেয়াল আছে?

বামুন বললেন, আস্তে গিন্নি, অতিথি শুনতে পাবেন। শোনো, যার যেমন আছে তাই দিয়ে অতিথিসেবা করতে হয়। খাদ্যের চেয়ে যত্নটাই আসল।

এভাবে বোঝানোর পর বামনি একটু শান্ত হলেন। বললেন, ঠিক আছে, ঘরে কিছুটা তিল আছে, তাই কুটে গুঁড়ো করে অতিথিকে খাওয়াব।

স্ত্রীর কথা শুনে বামুন চলে গেলেন। আমি দেখি বামনি খানিকটা তিল গরম পানিতে কচলে খোসা ছাড়িয়ে রেখে দিলেন। তারপর ঘরের অন্য কাজে মন দিলেন।

এদিকে একটা কুকুর ঘুরতে ঘুরতে এসে কোটা তিলে মুখ দিয়ে বসল। দেখতে পেয়ে বামনি ছুটে এসে কুকুর তাড়িয়ে দিলেন। কপাল চাপড়ে বলতে লাগলেন, হায় হায়, কুকুরের মুখে অপবিত্র হওয়া জিনিস কী করে অতিথিকে দেব? তারপর একটু ভেবে নিজের থেকে বলতে লাগলেন, ঠিক আছে কোটা তিলগুলো নিয়ে কারুর বাড়িতে গিয়ে গোটা তিন নিয়ে আসি।

এই বলে তিলগুলো নিয়ে এক পড়শির বাড়িতে গেলেন। ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তা দেখার কৌতূহল হলো আমার। আমি ভিক্ষা করার ভান করে পড়শির বাড়িতে হাজির হলাম।

বামনি পড়শি বাড়ির গিন্নির কাছে গিয়ে কোটা তিলগুলোর বদলে গোটা তিল চাইলেন। গিন্নি বাড়ির ভেতর থেকে কিছু গোটা তিল নিয়ে এলেন। কোটা তিলের বদলে গোটা তিল দিতে যাবেন, এমন সময় তার ছেলে এসে বাধা দিল।

ছেলে মাকে বলল, মা, ও-তিল তুমি নিও না, নিও না। গোটার বদলে উনি কোটা তিল দিচ্ছেন। এমন তো কখনো হয় না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কারণ আছে। তুমি ও-তিল নিও না।

ছেলের কথায় মা আর নিলো না। বামনি ফিরে গেলেন। আর ছেলেটির বুদ্ধি দেখে আমি থ। সেই থেকে কোথাও অস্বাভাবিক দেখলে আমার সন্দেহ হয়। বুঝতে পারি পেছনে কোনো কারণ আছে। তাই বলছিলাম কি ইঁদুরটার অত বাড়াবাড়ির পেছনেও কোনো কারণ আছে। আমার ধারণা ইঁদুরটার গর্তের মধ্যে কারণটা নিহিত আছে। তার গর্তের মধ্যে গুপ্তধন-টন থাকতে পারে। টাকার গরমেই তার এত লাফ-ঝাঁপ। এখন ওর গর্তটা খুঁজে বের করা দরকার।

বলো কী!

হ্যাঁ, অন্তত ওর আসা-যাওয়ার পথটাও যদি জানতে পারি তাহলেও হবে।

ইঁদুরটা তো একা আসে না। সঙ্গে থাকে দলবল। তাই যাতায়াতের পথটা দেখেছি। তবে তার বুদ্ধির বহর দেখে ভাবছি, সেখানেও যদি ফাঁকি দিয়ে না থাকে!

না না, তা হবে না। সকালে আমাকে একটা কোদাল দিও। যাতায়াতের পথ ধরে গর্তটা ঠিক বের করে নিতে পারব।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে বুঝতে পারলাম বিপদ একেবারে শিয়রে। আমার টাকার খবরটা যেমন করে জেনে গেছে তেমনি করে গর্তের খবরটাও ঠিক জেনে নেবে। আমি তক্ষুণি সোজা পথ ছেড়ে ঘুর পথে আমার গর্তের দুর্গে ফিরে চললাম। কিন্তু দলবল নিয়ে কিছুদূর যেতেই পড়ল সামনে যমদূত, বেড়াল। প্রকাণ্ড বড়। অমনি সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার দলের ওপর। ওতেই আমার দলের কয়েকটা শেষ, আরো কয়েকটার রক্তারক্তি অবস্থা। ওরা আমাকে গালাগাল দিতে লাগল ঘুরপথে এসেছি বলে। এজন্যই নাকি ওদের এই দশা, সোজা পথে গেলে এতক্ষণে তারা দুর্গে পৌঁছে যেত নিরাপদে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও আর ওদের সঙ্গে গর্তে না গিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিলাম।

ব্যস, পরদিন সকালে রক্তের দাগ ধরে সন্ন্যাসী সহজে আমার দুর্গ খুঁজে পেল। খুঁড়ে তছনছ করে আমার টাকার হাঁড়িটা নিয়ে গেল। ওটার ওপর আমি সবসময় থাকতাম। তার গরমে আমি ছিলাম শক্তিশালী, যে-কোনো দুর্গম জায়গায় লাফিয়ে চলে যেতে পারতাম। এভাবে তারা আমার সর্বনাশ করল।

তারপর আমি যখন খুঁজে তছনছ করা দুর্গে ফিরে এলাম তখন তো যা হবার সব শেষ। আমার মন ভেঙে পড়ল। কোথায় যাই কী করি, শুধু সেই হাহুতাশ। কী করব দিশকুল পেলাম না। তারপর দিনের সূর্য ডুবল, সন্ধে হল, চারদিকে নেমে এল অন্ধকার। তবুও দুরু দুরু বুকে দলবল নিয়ে গেলাম সেই মন্দিরে, সন্ন্যাসীর ঘরে। আমার চলাফেরা আওয়াজ পেয়েই তাম্রচূড় ফাটা বাঁশের শব্দ করতে লাগল।

তখন তার বন্ধু বাক্যচূড় বলল, কী বন্ধু এখনো নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারছ না?

তাম্রচূড় বলল, ভাই শয়তান ইঁদুরটা আবার দলবল নিয়ে এসেছে। আমি শুনতে পাচ্ছি। তাই ফাটা বাঁশের আওয়াজ করছি।

দুষ্ট বাক্যচূড় হেসে বললেন কী জানো? বললেন, আর ভয় নেই। টাকা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ের গরমও শেষ, অত লাফাতেও পারবে না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। আর কী আশ্চর্য! ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও লাফ দিয়ে আর হাঁড়িটায় চড়ে বসতে পারছি না। মাটিতে পড়ে গেলাম। আর সেই শব্দ শুনে দুষ্ট অতিথি জেগে গিয়ে বললেন, ওই দেখো, টাকা গেছে ওর শক্তিও শেষ।

হতাশ হয়ে, অপমানে, রাগে ফিরে এলাম। আমার দলবল সেই থেকে আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে লাগল। দলনেতা হিসাবে আর মানে না। আমি শুনতে পাই মতো

মন্থর হিরণমুখ বেরিয়ে এলো। একটা হরিণ মনে হয় পানি খেতে এসেছে।

এমন এমন কথা বলতে লাগল যে আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমার খাস ভৃত্যরাও আমার কথা আর শোনে না। বেশি কিছু বললে মুখের ওপর কথা শুনিয়ে দেয়।

আমি তো বুঝতে পারলাম টাকার ভাণ্ড খুইয়ে আমার সেই অবস্থা। তখন আমি ঠিক করলাম যেভাবেই হোক টাকা আমার চাই, আমার টাকা আমি ফিরিয়ে আনব। আমার সম্পত্তি অন্যকে ভোগ করতে দেব না।

আমি দেখতে পেয়েছিলাম আমার টাকা একটা থলেয় করে তাম্রচূড় তার বুকের কাছে রেখে ঘুমোন। ঠিক করলাম থলে কেটে টাকা বের করে আনব। এক রাতে একা একা ঢুকলাম। দেখি তাম্রচূড় ঘুমিয়ে পড়েছেন। চুপি চুপি গেলাম। কুট কুট করে কাটতে শুরু করলাম। কিন্তু ভাগ্য তখন আমার পক্ষ ছেড়ে চলে গেছে। সামান্য কুট কুট শব্দেই তাম্রচূড় জেগে গেলেন। আর একটু হলেই একেবারে নিকেশ হয়ে যেতাম। বাড়িটা মাথায় না পড়ে গায়ে সামান্য পড়েছিল। কোনো মতে পালিয়ে আসতে পারলাম। তারপর আর ও-মুখো হই নি। আমার ধন, মান, প্রতিপত্তি সব শেষ। রাজত্বও গেছে। আমি একা একা সেই গর্তে থাকতাম। কীসের লোভে আর সেখানে থাকব বলো, কার জন্য থাকব। ঠিক তখনই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল লঘুপতনের সঙ্গে। ভাগ্যিস তখন তাকে বন্ধু পেয়েছিলাম। আমার বন্ধু

আমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে। আর তুমি আজ নতুন বন্ধু হলে মন্থর। এই হল আমার কাহিনী।

হিরণমুখের দুঃখের কাহিনী শেষ হলে মন্থর বলল, ভাই হিরণমুখ, লঘুপতন যে তোমার প্রকৃত বন্ধু তাতে সন্দেহ নেই। তুমি তার খাদ্য হলেও সে খিদেয় শুকিয়ে, এত কষ্ট সহ্য করে এখানে নয়তো নিয়ে আসত না। পথেই তোমাকে খেয়ে ফেলত। ওর ওপর আমার বিশ্বাস আরও বাড়ল। বুঝতেই তো পারছ, আমি হলাম জলচর আর ও-হল মাংসখেকো কাক। এই দু'জনের বন্ধুত্ব তো সহজ কথা নয়। এখন তুমি নিশ্চিন্তে এই বিলে থাকো। এ তোমার নিজের বাড়ি মনে করো। টাকা হারিয়েছ, বিদেশে থাকতে হচ্ছে—এসব ভেবে দুঃখ করো না। দুনিয়ার সবকিছুই দু'দিনের। এখানে নতুন জীবন শুরু করো। তিন বন্ধুতে মিলে থাকব, তিন ভাই মনে করো, আমাদের দিন সুখেই কাটবে।

কাক, ইঁদুর ও কচ্ছপ তিন জায়গার তিন বন্ধু এক জায়গায় একত্রিত হয়ে সুখে গল্প করে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন বেলা পড়ে এসেছে, সূর্য বিলের ওপারে গাছের নিচে লটকে পড়েছে। তিন বন্ধু বিলের পাড়ে একটি পাকুড় গাছের নিচে বসে গল্প করছে। এমন সময় বন থেকে ছুটতে ছুটতে এক হরিণ এসে হাজির। শব্দ পেয়ে অনেক আগেই তিনজনে তিন জায়গায় লুকিয়ে পড়েছে।

হরিণকে দেখতে পেয়ে গাছের ডাল থেকে লঘুপতন প্রথমে মুখ খুলল। সে বলল, মন্থর, হিরণমুখ, ভয় নেই, বেরিয়ে এসো। একটা হরিণ মনে হয় পানি খেতে এসেছে। ও হল ঘাসখেকো। আমাদের ক্ষতি করবে না।

নলবনের ভেতরে লুকিয়ে ছিল হিরণমুখ। বন্ধুর অভয় পেয়ে বেরিয়ে এল। পানি থেকে উঠে এল মন্থর।

মন্থর বলল, হরিণটি মনে হয় ব্যাধের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে।

শুনে হরিণ বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। ফাঁদ পেতে ব্যাধেরা আমার দলটিকে ধরেছে। আমিই কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি। হায়, একেবারে একা হয়ে গেলাম।

মন্থর বলল, তোমার নাম কি ভাই?

হরিণ বলল, আমার নাম চিত্ররূপ। হরিণদের দলপতি। এখন আমি একা।

লঘুপতন গাছের নিচু ডালে নেমে এসে বলল, ভাই চিত্ররূপ, তুমি নিশ্চিন্তে বসো। আমি দেখতে পেলাম ব্যাধেরা কাঁধে হরিণদের নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শুনে চিত্ররূপ নীরবে কাঁদতে লাগল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। তিন বন্ধু তাকে ঘিরে বসে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তাদের সান্ত্বনায় চিত্ররূপ মনের শোক অনেকটা হালকা করল। চোখ মুছে নিলো।

দিনের শুরুটা তাদের খাবারের সন্ধানে কেটে যায়। ফিরে এসে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত তারা গল্প করে। নানা দেশের কথা, নানা গল্প। সকলে তো আর কম

দেখে নি, কম কষ্ট পায় নি। জীবন তো আর কুসুমশয্যা নয়। লোকে ভাবে বনে কত সুখ। লঘুপতন বলে, সবাই বলে পাখিদের কী, অবাধ নীল আকাশ আছে। কিন্তু পাখিদের বিপদ কত দিক থেকে আসে কিছুই জানে না।

এমনি করে দিন কাটে। কিন্তু একদিন বিপদ ঘনিয়ে এল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তবুও চিত্ররূপ গল্পের আসরে ফিরে এল না। ভয়ে-ভাবনায় তিনজনের মুখ শুকিয়ে এল। চিত্ররূপের কী হল কেউ বুঝতে পারল না। হরিণের শত্রু চারদিকে। সে ব্যাধের হাতে পড়ল, নাকি বাঘের মুখে পড়ল, নাকি ছুটতে গিয়ে গর্তে পড়ে পা ভেঙে গেল—কতরকম বিপদই না হতে পারে। তিন বন্ধু ভেবে ভেবে সারা।

এমন সময় মন্থর বলল, ভাই লঘুপতন, বেলা তো পড়ে এল, তুমি একটু চারদিকটা দেখে এসো না। বন্ধুর খবর না পেয়ে তো স্থির থাকতে পারছি না।

লঘুপতন পাখা মেলে চলে গেল। কিছু দূর গিয়ে দেখে চিত্ররূপ ব্যাধের জালে আটকে আছে। লঘুপতনকে দেখে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা শুরু হল।

চিত্ররূপ বলল, ভাই লঘু, বন্ধুদের গিয়ে বলো তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। একটু পরেই ব্যাধ এসে আমাকে মেরে নিয়ে যাবে।

লঘুপতন অস্থির হয়ে বলল, অমন কথা বলো না ভাই। তোমাকে হারালে আমরা বাঁচব না। তুমি একটু স্থির হও। আমি এক্ষুণি গিয়ে হিরণমুখকে নিয়ে আসছি। সে এসে চোখের পলকে তোমার জালের দড়ি কেটে দেবে।

এই বলে লঘু তীরের বেগে ছুটে গেল। বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে চিত্ররূপের কথা খুলে বলল। চিত্ররূপের বিপদের কথা শুনে হিরণমুখ এক লাফে লঘুর পিঠে চড়ে বসল। লঘু সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পাড়ি দিয়ে চলল। ওদিকে ছলছল চোখে চিত্ররূপ তাকিয়ে আছে তাদের পথের দিকে। লঘু আসতেই হিরণমুখ এক লাফে নেমে নিজের কাজে লেগে গেল।

লঘু বলল, সব ভাগ্যের ফের ভাই, নইলে তুমি জালে পড়বে কেন? আর আমরাও-বা হিরণমুখের মতো বন্ধু পাব কেন। ওদিকে ক্ষুরের মতো ধারালো দাঁত দিয়ে এরি মধ্যে চিত্ররূপের জাল কেটে শেষ। মুক্ত হয়ে সে বলল, বন্ধু, তোমাদের জন্য আজ আমার জীবন ফিরে পেলাম।

এমন সময় ঘাসের বনে খসখস শব্দ উঠল। ব্যাধের পায়ের শব্দ মনে করে এক লাফে চিত্ররূপ আরেকটি ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

গাছের ওপর থেকে লঘু বলল, না হে, ব্যাধ নয় মন্থর আসছে। ওর আসা মানে আরেক বিপদ। এখন যদি ব্যাধ এসে পড়ে ওরই হবে বিপদ। তখন ও-তো আমাদের মতো দ্রুত পালাতেও পারবে না। কাজটা সে মোটেই ভালো করল না।

এমন সময় ঘাসের ওপর গলা বাড়িয়ে দিল মন্থর। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বন্ধুর বিপদের কথা শুনে আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, বন্ধুর বিপদে যদি কিছু করতে পারি। এই ভেবে প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে পড়েছি। এখন চিত্ররূপকে

বিপদমুক্ত দেখে খুশি। ভাই চলো চলো, এমন বিপদ আর বাধিও না।

ঠিক তখনই গাছের ওপর থেকে লঘু ডেকে বলল, ব্যাধ আসছে, সাবধান। বলতে না বলতে চোখের পলকে চিত্ররূপ হাওয়া। বেচারি মন্থর পালাতে পারল না। পড়ল ধরা।

জাল ছিঁড়ে হরিণ পালিয়েছে বুঝতে পেরে ব্যাধ বেজার মুখে জাল গুটিয়ে নিল। তারপর লতার দড়ি দিয়ে মন্থরকে বেঁধে ধনুকের আগায় ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

একটু পরেই লঘুপতনের ডাকে চিত্ররূপ ও হিরণমুখ এক জায়গায় একত্রিত হল। বন্ধু মন্থরের শোকে তারা চোখের পানিতে ভাসছে।

কাঁদতে কাঁদতে হিরণমুখ বলল, অমন বন্ধু হারিয়ে আমরা কেউ বাঁচব না। মন্থরকে ফিরে পাওয়ার একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে।

লঘুপতন বলল, ফন্দি আর ঠিক করে ফেলেছি। শোনো, ব্যাধ যাবে বনের ভেতর দিয়ে। তার পথের ধারে কোনো জলাশয়ের পাড়ে চিত্ররূপ গিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকবে। আমি তোমার মাথার কাছে বসে এমনভাবে তোমাকে ঠোকরাব, ব্যাধ দেখেই ভাববে তুমি মরে গেছ। তখন হরিণের চামড়ার লোভে সে মন্থরকে ধনুসহ রেখে তোমাকে দেখতে আসবে। আর সেই ফাঁকে হিরণমুখ মন্থরের বাঁধন কেটে দেবে। অমনি মন্থর চলে যাবে জলাশয়ে, ব্যস, ব্যাধ আর তোমার নাগাল পাবে না। এদিকে চিত্ররূপও তখন দেবে ছুট, আমি উঠে যাব গাছে।

লঘুর বুদ্ধি ও পরামর্শ সবার পছন্দ হলো। অমনি এক লাফে হিরণমুখ লঘুর পিঠে চেপে বসল। চিত্ররূপও ছুটল। লঘু ব্যাধের পথের নিশানা ধরে এক সময় আগে চলে গেল।

ব্যাধ চলছে আপন মনে। কাঁধে ধনুকের একদিকে মন্থর। চলতে চলতে একটা ডোবা দেখতে পেল। ডোবার পাশে একটি হরিণ মরে পড়ে আছে দেখতে পেল। একটা কাক তার কানের কাছে ঠোকরাচ্ছে। আর ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছে কাকের স্বভাব অনুযায়ী।

কাঁধের ধনুক ও মন্থরকে ঘাসের উপর রেখে ব্যাধ হরিণটাকে দেখবে বলে এগিয়ে গেল। অমনি হিরণমুখ এসে মন্থরের বাঁধন দিল কেটে। সে গুটি গুটি পায়ে ডোবার দিকে চলল। নেমে গেল পানিতে।

ব্যাধকে কাছে এগিয়ে আসতেই লঘু কা-কা ডাক দিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসল। চিত্ররূপ সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে উঠে হাওয়া। অবাক হয়ে ব্যাধ দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুই বুঝতে না পেরে সে ধনুকটা নিতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে বাঁধন ছিঁড়ে কচ্ছপ পালিয়েছে।

ধুত্তোরি! আজ দিনটাই গেল খারাপ—বলতে বলতে বেচারি ব্যাধ বাড়ির দিকে চলল।

ওদিকে মন্থর, লঘুপতন, চিত্ররূপ ও হিরণমুখ। চার বন্ধু আনন্দ করতে করতে, হাসতে হাসতে ফিরে গেল নিজেদের ডেরায়।

সোমিলের ভাগ্য নির্বাচন

সেই তাঁতির নাম সোমিল। খুব মিহি কাপড় বোনায় তার জুড়ি ছিল না। তার কাপড় দেশ থেকে বিদেশে যেত। রাজরাজড়ারা পছন্দ করত। কিন্তু এত নামডাক থাকলেও তার ভাগ্যটা ছিল খারাপ। অভাব তার ঘরে লেগেই আছে। কাপড় বেচে শুধু খাওয়া-পরা চলত, তার বেশি এক পয়সাও জুটত না।

সোমিলের গ্রামের অন্য তাঁতিরা বুনত মোটা কাপড়। হাটে তাদের কাপড় পড়ে থাকত না, সাধারণ মানুষে কিনে নিত। তাদের অবস্থা রমরমা। তাদের সংসারও চলত, টাকা-পয়সাও জমত। এসব দেখে সোমিলের নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল। সে একদিন বউকে বলল, এ দেশে আমার কিচ্ছু হবে না। এখানে সবাই সস্তা জিনিস চায়। ভালো জিনিসের কদর নেই। মোটা কাপড়ের তাঁতিরাই থাক, আমি চললাম বিদেশে। দেখি ভাগ্য ফেরে কি না।

তার বউ বলল, টাকা হবার হলে দেশেই হবে, বিদেশে যেতে হবে কেন? ভাগ্যে থাকলে এখানেই হবে, এখানেই লেগে থাকো।

সোমিল কিন্তু বউয়ের কথা শুনল না। টাকা রোজগারের জন্য বর্ধমান শহরে রওনা দিল। সেখানে সে তিন বছরে তিন শ' মোহর আয় করল। তারপর একদিন বাড়ির পথে পা বাড়াল। এখন সে খুব খুশি।

চলতে চলতে মাঝপথে বনের মধ্যে সন্ধে নেমে এল। রাতে হিংস্র জন্তুর ভয়ে সে গাছে চড়ে বসল। একটা মোটা ডাল দেখে তার সঙ্গে গামছা দিয়ে কোমর বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাতে আধো ঘুমের মধ্যে সোমিল স্বপ্ন দেখল। ভীষণ চেহারার দু'জন লোক কথা বলছে। তাদের একজন হল, মানুষের কপাল বা ভাগ্য, অন্যজন কর্ম।

একজন বলল, কী কর্তা, এই সোমিলের কপালে তো খাওয়া-পরার বেশি নেই। তাকে তিন শ' মোহর দিলে কেন?

অন্যজন বলল, ওহে সব কর্ম, সোমিলের চেষ্টার ফল তো তাকে দিতেই হবে।

যে চেষ্টা করে তাকে আমি দিতে বাধ্য। তুমি হলে ভাগ্য, শেষটা তোমার হাতে। পরিণাম তুমি জানো।

ঘুম ভেঙে যেতেই সোমিল উঠে বসে কোমরে হাত দিয়ে দেখে মোহরের থলি শূন্য। এত কষ্টে রোজগার করা মোহর, কীভাবে হাওয়া হয়ে গেল! তার সব পরিশ্রমই মাটি। মনের দুঃখে সোমিল ভাবতে বসল। না, খালি হাতে বউয়ের কাছে ফিরে যাওয়া চলবে না। তাকে কী জবাব দেবে! পাড়াপড়শির কাছেও মুখ দেখাতে পারবে না। এই ভেবে সে আবার বর্ধমান শহরে ফিরে গেল। আরও এক বছর সে সেখানে কাপড় বুনল। এবারে এক বছরেই তার আয় হল পাঁচ শ' মোহর। সেই টাকা নিয়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

চলতে চলতে আবার সেই বনে এসে পৌঁছল। ঠিক সন্ধে তখন। মোহর হারাবার ভয়ে সে এবার থামল না। বাঘ-ভালুকে খায় খাক। ঘুমের ঘোরে কেউ মোহর নিয়ে যাবে তা সে হতে দেবে না। রাত থমথমে। জ্যোৎস্নার আলো-আঁধার বনের মধ্যে। সে চলল হন হন।

চলতে চলতে হঠাৎ সে শুনতে পেল দু'জন মানুষের গলা। সে গাছের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সোমিল শুনতে পেল তাদের কথা। দেখতে পেল স্বপ্নে দেখা সেই দু'জনকে।

একজন বলল, কী কর্তা, এবারেও তুমি সোমিলকে পাঁচ শ' মোহর দিলে? তুমি তো জানোই, খাওয়া-পরাটুকু ছাড়া ওর কপালে কিছুই নেই।

অন্য লোকটি বলল, ওহে সব কর্ম, সব তার কর্মের ফল। যে চেষ্টা করে তাকে আমি দিতে বাধ্য। শেষটা তোমার হাতে।

শুনে সোমিল আঁতকে উঠল। তাড়াতাড়ি সে হাত দিল কোমরের থলেতে। দেখল থলে ফুটো, একটি মোহরও তাতে নেই। বেচারি থ। বনের মাঝখানে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সে কিছুই বুঝতে পারল না। দুঃখে তার বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম। আর সহ্য করতে পারল না সে। গামছাটা নিয়ে সেই গাছে উঠে পড়ল। এবার সে ফাঁস খেয়ে মরবে। গামছাটা সে ডালের সঙ্গে বাঁধল, আর এক পাশে ফাঁস কল লাগিয়ে গলায় দিতে যাবে, এমন সময় সে দেখতে পেল শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহাপুরুষ।

তাকে ডেকে সেই মহাপুরুষ বললেন, ওহে সোমিল, এমন ভুল করো না। তোমার মোহর আমি সরিয়ে নিয়েছি। কী করব, ভাত-কাপড়ের বেশি এক কড়িও বেশি হবে তোমার তা আমি সহ্য করব না। তুমি বাড়িতে ফিরে যাও। তবে তুমি যে দুঃসাহস দেখিয়েছ তাতে আমি সন্তুষ্ট। তাই তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি তোমার পছন্দ মতো বর চাও।

সোমিল বলল, বরই যদি দেবেন, তাহলে আমাকে অনেক টাকা দিন।

মহাপুরুষ বললেন, যে টাকা তোমার কপালে নেই, তুমি ভোগ করতে পারবে না, তা নিয়ে কী করবে? ভাত-কাপড়ের বেশি তোমার কপালে নেই।

ফাঁসকল লাগিয়ে গলায় দিতে পারে, এমন সময় সে দেখতে পেল শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহাপুরুষ।

সোমিল বলল, তা হোক। ভোগ করতে না পারলেও আমার টাকা চাই। অন্তত লোকে জানবে আমার টাকা আছে। সেটাই হবে আমার শান্তি ও সুখ।

মহাপুরুষ বললেন, তাহলে এক কাজ করো। তুমি আবার বর্ধমান শহরে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে দু'জন বণিকের সঙ্গে দেখা করো। তাদের একজনের নাম গুপ্তধন, সে কেবল টাকা জমায়। অন্যজন হল উপগুপ্তধন। সে টাকা না জমিয়ে দেদার খরচ করে। এই দু'জন লোক কে কেমন জেনে নিয়ে একজনের মতো হবার বর চাও। যদি মনে করো শুধু টাকা জমাবে, খরচ করবে না তাহলে তোমাকে গুপ্তধনের মতো করে দেব। আর যদি চাও লোকজনকে দিয়ে-খাইয়ে সব খরচ করে ফেলতে চাও তাহলে তোমাকে উপগুপ্তধন করে দেব।

এই বলে শূন্যে দাঁড়ানো মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সব স্বপ্নের মতো মনে হলো সোমিলের। অবাক হয়ে সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে গেল বর্ধমানে।

লোকের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে গুপ্তধনকে সে খুঁজতে লাগল। কেউ চেনে না তাকে। তবুও সে হাল ছাড়ল না। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির। একজন লোক খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছে সে দেখল। সোমিল তার কাছে গিয়ে গুপ্তধনের কথা জানতে চাইল।

লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সোমিলের চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, কী ব্যাপার, আত্মীয়-টাত্মীয় নাকি? নয়তো হাড়-কিপটে গুপ্তধনের খবর নিচ্ছেন কেন?

লোকটার কথা বলার ধরন দেখে লজ্জা পেল সোমিল। আমতা আমতা করে বলল, না, ঠিক আত্মীয় নয়। তবে তার বাড়িতে একবার যেতে চাই।

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ও বুঝেছি। টাকা ধার চাই? তা পাবেন, তবে তার জন্য উপযুক্ত কিছু বন্ধক রাখতে হবে। আর সেজন্য গুণতে হবে চড়া সুদ। ওই তো তার বাড়ি, যান সেজা গিয়ে ঢুকে পড়ুন।

একটা ভাঙাচোরা বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে লোকটা হন হন করে চলে গেল। বাড়ির চেহারা দেখে সোমিল মনে মনে ভাবল, হায় কপাল! লোকটি এত এত টাকা ধার দেয় অথচ বাড়িটা মেরামত করতে পারে না। অদ্ভুত লোক তো!

ভাবতে ভাবতে সে ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়ল। নোংরা-আবর্জনায় ভরা উঠোনে পা দিতেই বাড়ির হাড় জিনজিরে মালিক, তার বউ, ছেলে-পিলে তেড়ে-মেরে ছুটে এল। হাঁক-ডাক না দিয়ে সোমিল বাড়িতে ঢুকে পড়েছে বলে তাকে একপ্রস্থ গাল-মন্দ করল।

সোমিল কিছুই গায়ে মাখল না। মাখলে চলবে কেন? তাকে যে গুপ্তধন আর উপগুপ্তধন দু'জনকে জানতে হবে। এজন্যই সে এসেছে। সে কোনো কিছু আমল না দিয়ে একরকম জোর করে একটা খাটিয়ায় বসে পড়ল। তারপর বলল, আমি বিদেশী। রাতের জন্য একটু আশ্রয় চাই। সকালে উঠেই চলে যাব।

এটা গুপ্তধনের বাড়ি, লঙরখানা নয়। অন্য ব্যবস্থা দেখো—গলার শিরা ফুলিয়ে চোখ বড় বড় করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল গুপ্তধন।

সোমিলের তো এতে উঠলে চলবে না। লোকটাকে আরও জানতে হবে। তাই সে বলল, অতিথি নারায়ণ, অতিথি মঙ্গল। তাকে বিমুখ করলে গেরস্তের অকল্যাণ হয়, এই কথাটিও কী আপনার জানা নেই?

অমনি গুপ্তধন থমকে গেল। অকল্যাণ কথাটায় বোধ হয় একটু খটকা লাগল। তারপর বলল, অতিথি! নারায়ণ! তাই বলে মাথাটা কিনে নিয়েছেন নাকি! যান, পাশের ঘরে খাটিয়া আছে। শুয়ে পড়ুন গে। সকালে সূর্য ওঠার আগেই কিন্তু বিদায় হওয়া চাই।—এই বলে সে বউ-ছেলেদের নিয়ে বাড়ির অন্যদিকে চলে গেল।

সোমিল মনে মনে বলল, লোকটা টাকার কুমির, কিন্তু হাড়-কিপটে। তবুও আর একটু দেখি। তারপর সে রাত কাটাবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকল। ঘরের দেয়ালগুলোর ইট দাঁত বের করে আছে। এখানে-ওখানে ইঁদুরের গর্ত। এক পাশে

ভাঙা খাটিয়াটা, তাতে নোংরা একখানা কাঁথা, তেলচিটে ছেঁড়া বালিশ। দেখেই সোমিলের ঘেন্না ধরে গেল। তবুও খাটিয়ার এক পাশে গিয়ে বসল। রাতটা তাকে বসে বসেই কাটাতে হবে। কী আর করা!

একটু পরে গুপ্তধনের বউ কার সঙ্গে গজগজ করতে করতে ঘরে ঢুকল। তার গায়ে তাল্লি-মারা শাড়ি ও ব্লাউজ, তেমনি নোংরা। দেখেই গা ঘিনঘিন করে। ভাঙাচোরা একখানা থালা হাতে। তাতে দু' খানা পোড়া রুটি ও পাশে শাক ভাজা। আর এক গ্লাস পানি। সোমিল বুঝতে পারল ওটা অতিথির রাতের খাবার। সেটা রেখে কিছু না বলে গুপ্তধনের বউ চলে গেল।

কৌতূহলবশত সোমিল গ্লাস থেকে একটু পানি দিয়ে হাত ধুয়ে শাকটা মুখে দিয়ে দেখল। তাতে তেল বা নুন কিছুই নেই। অমনি বমি পেল তার। রুটি থেকে একটা টুকরো কোনো মতে ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখল। তাও পোড়া, শক্ত ও খাবার অযোগ্য। সোমিল পানিটা খেয়ে থালা ও গ্লাস নিচে নামিয়ে রাখল। ভাবল, দেখা যাক ইঁদুর ও ছুঁচোয় খায় কি না।

মশা তাড়াতে তাড়াতে খাটিয়ায় বসে রইল সোমিল। মাঝ রাতে একটু ঝিমুনি এল। সারা দিনের হাঁটাহাঁটিতে চোখ-দুটো জড়িয়ে এল।

আধো ঘুমে সে দেখতে পেল সেই দুই লোক কথা বলছে।

একজন বলল, কী হে কর্তা, সোমিলকে খেতে দিয়ে গুপ্তধনের যে বাড়তি খরচ হয়ে গেল, এটা তো তার কপালে ছিল না।

অন্যজন বলল, ওহে কর্ম, আমার কী দোষ! মানুষের আয়-ব্যয় তো থাকবেই। গুপ্তধনের খরচ হয়ে থাকে তুমি পূরণ করে দেবে।

তারপরেই ওরা মিলিয়ে গেল। আর আধো-ঘুমে আধো জাগরণে সোমিলের রাতটা কেটে গেল। কষ্টের রাতও এক সময় শেষ হয় বৈকি।

ভোর হতে না হতেই বাড়ির ভেতরে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। সোমিল একটু কান পাততেই শুনতে পেল গুপ্তধনের ভেদ বমি হয়েছে। তার স্ত্রী তখন বলল, চেঁচামেচি করার মতো কিছু হয় নি। একদিন উপোস করে থাকলেই সেরে যাবে।

দুর্বল ও অসুস্থ গলায় গুপ্তধন বলল, অতিথি সেবার বাড়তি খরচটা তাতে পুষে যাবে। দেখো তো অতিথিটা গেছে কি না! থাকলে মেরে তাড়িয়ে দাও।

একথা শুনেই সোমিল খাটিয়া থেকে তড়াক করে উঠে ছুটে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল। টাকার কুমির গুপ্তধনকে তার চেনা হয়েছে। এবারে উপগুপ্তধঘন। তার বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে।

পথঘাটে সবে লোকজনের চলা শুরু হয়েছে। পাখিরা ডাকছে। হাঁটতে হাঁটতে সে বড় একটা মাঠের কাছে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে লোকজন প্রাতর্ভ্রমণ করছে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেও ছোটাছুটি করছে। একটা ছেলেকে ডেকে উপগুপ্তধনের

বাড়িটা চেনে কি না জানতে চাইল।

ছেলেটো বলল, ওই তো। আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।—বলে ছেলেটি তাকে নিয়ে একটা বড় বাড়ির সামনে গেল। বাড়িও তেমনি সুন্দর। সামনে উঠোন, তারপর ফুলের বাগান। এদিকে-ওদিকে সুন্দর সুন্দর গাছপালা। অন্যদিকে একটা পুকুর, তাতে নীল পদ্ম ফুটে আছে।

ছেলেটা বলল, দেখবেন সামনের বাগানে বণিক হয়তো পায়চারি করছেন। ফটক খুলেই এগিয়ে যান।

ছেলেটি চলে গেল। সোমিল এগিয়ে গেল বাগানের দিকে, তারপর উঠোন। আহা, বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল সোমিলের। দু'পাশের ফুল ও লতা, ফল ও গাছ দেখতে দেখতে সে চলল। আর কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বিশাল বকুল গাছের বাঁধানো তলায় বসে এক মাঝ বয়সী সুপুরুষ কী যেন লিখছেন। সোমিলের দিকে চোখ পড়তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

উপগুপ্তধন হাসি মুখে বললেন, আসুন আসুন। অনেক পথ হেঁটে আসছেন বোধ হয়। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। সকালে কিছু মুখেও দেন নি নিশ্চয়ই।—বলতে বলতে এগিয়ে এসে সমাদর করে সোমিলকে ঘরে নিয়ে বসালেন। সোমিল বুঝতে পারলেন তিনিই বাড়ির মালিক উপগুপ্তধন। তাঁর হাবভাব ভালো করে দেখতে লাগল সোমিল।

উপগুপ্তধনের ডাকে বাড়ির চাকর ছুটে এল। ওরা দু'জন। উপগুপ্তধন তখন বললেন, দয়া করে এদের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে চলে যান, মুখ-হাত ধুয়ে সকালের খাবারটা খেয়ে নিন। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে। ধীরে-সুস্থে সব হবে।

সেই বাড়িতে সোমিল পরম আদর-যত্নে পেট ভরে খেল। কত দিন সে এমন সেবা পায় না। ঘরের কথা তার মনে পড়ে গেল। তখন চাকর দু'জন তাকে বিশ্রাম করার জন্য সুন্দর একটা ঘরে নিয়ে গেল। ধবধবে নরম বিছানা। আরামে ও আনন্দে তার শরীর-মন জুড়িয়ে গেল। তার ঘুম পেয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে দুপুরে খেল পাঁচ রকম তরকারি দিয়ে, তার সঙ্গে ফল ও মিষ্টি তো আছেই। রাতে উপগুপ্তধন নিজে উপস্থিত থেকে যত্ন করে খাওয়ালেন। এমন আদর-আপ্যায়ন সামান্য তাঁতি সোমিলের জীবনে আর কখনো পায় নি। তার মনে হল সে বুঝি অন্য কোনো জগতে এসে পড়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সে ঘুমুতে গেল। বিছানায় পড়তেই ঘুম এসে চোখ বুজিয়ে দিল। উপগুপ্তধনের সঙ্গে আলাপ করার সময়ও হল না।

মাঝরাতে সোমিল শুনতে পেল সেই দুই পুরুষের কথাবার্তা।

একজন বলল, কী হে কর্তা, সোমিলকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে উপগুপ্তধনের তো দোকানের ধার আরো বেড়ে গেল। শুধবে কী করে!

অন্যজন বলল, ওহে কর্ম, আমি যা করার করেছি। পরিণাম তোমার হাতে।

কথা বলতে বলতে দু'জনই অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভোরে সোমিলের ঘুম ভাঙল। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে, সকালের সব কাজ সেরে, খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর সোমিল বাগানে গেল উপগুপ্তধনের কাছে বিদায় নিতে। আগের দিনের মতো তিনি বকুলগাছের নিচে বেদিতে বসে লেখাপড়া করছিলেন। অতিথিকে দেখে তিনি গদগদ হয়ে বললেন, আমার সামান্য আয়োজন, সামান্য খাওয়া-দাওয়া। আপনাকে বেশি আদর-যত্ন করতে পারি নি। দয়া করে দোষ নেবেন না। আবার কখনো এদিকে এলে দয়া করে দেখা করে যাবেন।

সোমিল হাত জোড় করে বলল, দোষ-ত্রুটির কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার আদর-যত্নের তুলনা হয় না। আপনার কথা চিরকাল মনে থাকবে। আপনার মঙ্গল হোক।

এমন সময় রাজবাড়ির পেয়াদা এসে উপগুপ্তধনকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে একটা থলে সামনে রাখল। পেয়াদা বলল, মহারাজ আপনার দান-খয়রাতের কথা শুনে খুশি হয়ে এই মোহরগুলো উপহার পাঠিয়েছেন। এই মোহর আপনার কাজে লাগলে তিনি খুশি হবেন। সোমিল নিজের চোখে সব দেখল ও শুনল।

সোমিলের আর জানার কিছু বাকি রইল না। সে আর অপেক্ষা করল না। উপগুপ্তধন থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা বাড়াল।

চলতে চলতে সে ভাবতে লাগল। হাড়-কিপটে গুপ্তধনের মতো ধনের মালিক হয়ে আর কাজ নেই। ওর টাকা ওর কাছে থাক। লাইবা থাকল জমানো টাকা, ওই উপগুপ্তধনই ভালো। দান-ধর্ম করে অর্থ ভোগ করার মতো সুখ ও আনন্দ আর কিছুতে নেই। টাকা জমিয়ে রেখে কী লাভ? বিধাতা তাকে উপগুপ্তধনের মতোই যেন করেন। লোকজনকে দিয়ে, নিজে খেয়ে জীবন কাটাতে পারলেই সুখ। শুধু টাকা নয়, মনও থাকা চাই।

পঞ্চতন্ত্রের বচন

১. ঘাস ও মানহীন মানুষের ধরন-ধারণ এক। শক্তি নেই বলে দুই-ই নুয়ে পড়ে, আর সারহীন বলে হালকা।

২. দোষী লোক যখন বিচারের স্থানে আসবে তখন সে হেঁট হয়ে বা এলোমেলো পা ফেলে হাঁটবে। মুখ থাকবে ফ্যাকাশে। কপালে ঘাম ছুটবে, কথা বলবে মিনমিন করে। আর নিরপরাধ লোকের মুখ থাকবে প্রসন্ন, কথা হবে স্পষ্ট, চাউনিতে রাগ থাকবে আর সভায় কথা বলবে সতেজে, থাকবে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসব চিহ্ন দেখে তাকে চিনে নিতে পারে।

৩. ময়লা কাপড় পরা মানুষ যেমন যেখানে-সেখানে বসে পড়তে ইতস্তত করে না, তেমনি একবার সৎ পথ ছাড়া লোকের কোনো অসৎ কাজেই আর অরুচি থাকে না, থাকে না চরিত্র।

৪. যারা হয়কে নয়, নয়কে হয় করে, তাদের ধারে-কাছে থাকাও বিপদ।

৫. নিজের শক্তি বুঝে-শুনে সগর্বে যে শত্রু নিধন করতে যায় সে একাই একশো শত্রু মারতে পারে।

৬. যার রাগের কোনো কারণ থাকে, সেই কারণটি চলে গেলে সেও শান্ত হয়। কিন্তু যে অকারণে রাগ-দ্বেষ করে তাকে শান্ত করা যায় না।

৭. গুণগ্রাহী না হলে ভৃত্যরা বাধ্য থাকে না।

৮. উপদেশ দিয়ে স্বভাব বদলানো যায় না। পানি যতই গরম করা যাক কিছু সময় পর যে-কে সেই ঠাণ্ডা। চাঁদ বরং গরম হলেও হতে পারে, কিংবা আগুন ঠাণ্ডা। মানুষের স্বভাব কিন্তু কিছুতেই বদলানো যায় না।

৯. লোভ থাকা ভালো; কিন্তু অতি লোভ কখনোই ভালো নয়।

১০. বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করে কাজে নামে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এমন লোকেরই যশ ও ধনলাভ হয়।

১১. যার যেমন ভাব তা বুঝে মেধাবী ব্যক্তি তাকে চট করে বশে নিয়ে আসতে পারে।

কাকলূকীয়

কাক ও উলূকের গল্প হল কাকলূকীয় বা সন্ধি-বিগ্রহ। উলূক হল পেঁচা। কাকের সঙ্গে পেঁচার শত্রুতা কী করে হল তার কাহিনী। চিরশত্রু কী করে দমন করতে হল তার কৌশলও এসব গল্পে পাওয়া যায়। জন্মগত শত্রুতা যাদের মধ্যে তাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তার হদিস মিলবে। জন্মশত্রুকে দমন করার কেমন কৌশল নিতে হয় সে-সব নিয়েই এই গল্পগুলো রচিত।

সিংহ ও শেয়ালের শত্রুতা চিরকালের। আবার প্রয়োজনে শেয়াল সিংহের অনুগ্রহও আকাঙ্ক্ষা করে। এক সিংহ স্নেহবশত এক শেয়ালছানাকে ঘরে নিয়ে আসে। সিংহীও শেয়ালছানাকে না মেরে নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে ভরণপোষণ করতে থাকে। কিন্তু একদিন সিংহী শেয়ালছানাকে বলে দিল যে সে তার সন্তান নয়, কাজেই শেয়ালছানাকে তার জাতভাইদের কাছে চলে যেতে বলে। তা না হলে সিংহীর ছানারা বড় হয়ে শেয়ালছানাকে শেষ করে ফেলবে।

চড়ুই, খরগোশ ও বেড়াল

এক

ছিল কাক, তার নাম মেঘবর্ণ। আর চড়ুই, তার নাম কপিঞ্জল। তারা থাকত বনের মধ্যে মস্ত বড় এক পাকুড়গাছে। দু'জনে গলায় গলায় ভাব। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারত না। প্রতিদিন ভোরবেলায় তারা বেরিয়ে যায় খাবারের খোঁজে। সূর্য পাটে গেলে ফিরে আসে। তারপর ঘুমুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গল্পগুজব করে। সারা দিন কে কোথায় মজার জিনিস দেখেছে, এসব কথা একে অপরকে শোনায়।

এভাবে মহা আনন্দে দিন কাটছিল দু' জনের। একদিন সকাল এক দল চড়ুয়ের সঙ্গে কপিঞ্জল চলে গেল শালি ধান খেতে। যাওয়ার সময় চড়ুই বলল, ভাই মেঘবর্ণ, ধান-টান খেয়ে দু' দিন লাগতে পারে। আমার বাসাটা একটু দেখো।

দু' দিন কেটে গেল কপিঞ্জল আর আসে না। মেঘবর্ণ আশায় আশায় থাকে। তার ভালো লাগে না। শেষে সে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ফাঁদে আটকে পড়ল, নাকি বাজপাখি ধরে খেল—এমনি ভেবে অস্থির মেঘবর্ণ।

এদিকে হয়েছে কী, এক খরগোশ ছুটতে ছুটতে এসে পাকুড় গাছের কাছে এসে চড়ুইয়ের গর্তটা খালি পেয়ে ঢুকে পড়ল। বাসা বেশ বড়, তার খুব পছন্দ হল। নিজের বাসা থেকে মেঘবর্ণ সব দেখল। সে খরগোশকে কিছু বলল না।

দিন কয়েক পরে কপিঞ্জল ফিরে এসেছে। শালিধান খেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়েছে। মেঘবর্ণ তখনো ফেরে নি। কপিঞ্জল খুশি মনে বাসায় ঢুকতে গিয়েই দেখে সেখানে এক খরগোশ।

চড়ুই বলল, ওহে খরগোশ, করেছ কী! তুমি আমার বাসায় ঢুকে আছো যে! চটপট বেরিয়ে এসো।

কোটর থেকে মুখ বের করে খরগোশ বলল, তুমি কে হে?

চড়ুই বলল, আমি কপিঞ্জল। বাসাটা আমার। তুমি বের হও।

খরগোশ বলল, আবদার? কত খুঁজে বাসাটা পেয়েছি, ঝামেলা করো না বাপু। তুমিই সটকে পড়ো।

কপিঞ্জল রেগে-মেগে বলল, এ আমার বাড়ি। ক'দিন বাইরে ছিলাম, অমনি জবরদখল করলেই হল?

খরগোশ বলল, বেশ করেছি। যে বাসা ছেড়ে গেছ সেটা তোমার হল কী করে? ভাগো এখান থেকে।

চলল, দু' জনের ঝগড়া, চলল। কিন্তু খরগোশ বাসার দখল ছাড়ল না। চড়ুইও ঘ্যান ঘ্যান করে সমানে তার দাবি জানাতে লাগল।

ঝগড়ার ফয়সলা যখন কিছুতেই হচ্ছে না তখন চড়ুই বলল, শোনো ভাই, ঝগড়া বাড়িয়ে কাজ নেই। চলো, বনে কত সাধু-সন্ন্যাসী থাকেন, তাঁদের কাছে যাই। তাঁরা সব শাস্ত্র জানেন, বিচার করে দেবেন ঠিক ঠিক। তাহলে হবে তো?

খরগোশ বলল, কথাটা মন্দ বলো নি। চলো তাহলে।

বনের মধ্যে নদীর ধারে বড় গাছের নিচে সন্ন্যাসীরা-ফকিরেরা ধ্যান করেন। কপিঞ্জল ও খরগোশ তাঁদের একজনকে খুঁজতে গেল।

এদিকে হয়েছে কী, তাদের ঝগড়া আড়ি পেতে শুনেছিল এক বেড়াল। সে ভাবল, এই তো মোক্ষম সুযোগ। এবার পরিশ্রম না করে দুটোকে সাবাড় করা যাবে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে নদীর ধারে এক বটগাছের নিচে গলায় মালা পরে সাধু সেজে, চোখ বুজে, এক হাত বুকে রেখে ঘন-ঘন মালা জপতে লাগল। মাঝে মাঝে পিট পিট করে দেখছে চড়ুই ও খরগোশ আসছে কি না।

ওদের আসতে দেখে বেড়াল-তপস্বী জোরে জোরে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। বলতে লাগল, দয়াল বাবা, দীনবন্ধু, বিষয়-আসয় স্ত্রী-পুত্র কেউ কারো নয়। প্রভু, এবার তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার পায়ে ঠাঁই দাও।

চড়ুই ও খরগোশ দাঁড়িয়ে পড়ে মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগল তপস্বীকে। খরগোশ কান খাড়া করে বলে, চড়ুই ভায়া, ইনিই পারবেন আমাদের বিচার করতে। এ হল আসল সাধু।

কপিঞ্জল বলল, বেশ চলো। তবে কী জানো, এ হল বনবেড়াল, আমাদের জাতশত্রু, ধাড়ির এক শেষ। বেশি কাছে যাওয়া যাবে না। হঠাৎ যদি ধ্যান ভেঙে যায় বিপদে পড়ে যাব।

ওরা দু' জন দূর থেকে বলল, প্রণাম সাধুবাবা, আমাদের একটু দয়া করুন। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

বেড়াল চোখ বুজেই বলল, বাবারা, সবই তাঁর ইচ্ছা। তোমাদের যা বলার আছে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি।

খরগোশ বলল, আমাদের দু' জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, আপনি তার মীমাংসা করে দিন। তবে টাকা-কড়ি নেই, দিতে পারব না। তার বদলে যার কথা মিথ্যে হবে, তাকে ধরে খাবেন।

চড়ুই ও খরগোশ দাঁড়িয়ে পড়ে মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগল তপস্বীকে।

একথা শুনেই তড়াক করে সাত হাত পিছিয়ে গিয়ে জিভ কেটে বলল, সর্বনাশ! সর্বনাশ! ওসব পাপ কথা মুখেও এনো না বাপু। হিংসা হল নরকের পথ। আমি নিত্য শরণ করি দয়াময়ের কথা। প্রভু হে, দয়াময়, তুমি সকলকে দয়া করো, সবাইকে অভয় দাও।

শুনে কপিঞ্জল ও খরগোশ ভরসা পেল। তারা হাত জোড় করে বলল, তাহলে দয়া করে আমাদের ঝগড়াটা মিটিয়ে দিন।

তপস্বী, বলল, তবে কি না বুড়ো হয়েছি তো, একটু কাছে এসে বলতে হবে। আগের মতো আর শুনতে পাই না। কবে যে দয়াময় আমাকে পরপারে নিয়ে যাবে!

কপিঞ্জল ভয়ে ভয়ে দু' পা এগিয়ে গিয়ে বলল, বাবাজি, পাকুড়গাছের কোটরে আমার বাসা ছিল। দিন কতেকের জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে শালিধান খেতে গেছি। বাসাটা খালি ছিল। এই খরগোশ এসে দখল করে নিয়েছে। কাক মেঘবর্ণকে বলে গেছি একটু দেখতে। সেও বাসায় ফেরে নি বলে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসতে পারি নি।

বেড়াল বলল, সাক্ষী-টাক্ষী লাগবে না। একটু আস্তে আস্তে বলো বাছা, সবটা শুনতে পাই নি। আর একটু কাছে এসে বলো।

এবার খরগোশ এগিয়ে এসে বলল, আমিই বলছি বাবাজি। শুনুন। শেয়ালের তাড়া খেয়ে একদিন পালাতে গিয়ে গাছের ফাঁকা কোটর আমার চোখে পড়ে যায়। তখন থেকেই আমি সেখানে থেকে যাই। কেউ আমাকে ঢুকতে বারণ করে নি।

দিন কয়েক সেখানে আরামেই আছি। আজ সকাল না হতেই কোত্থেকে চড়ুইটা এসে হল্লা জুড়ে দিয়েছে। বলছে ওর বাসা। কিছুতেই আমার কথা শুনছে না।

বেড়াল কানের কাছে থাবা নিয়ে খরগোশের কথা ভালো করে শুনল। তারপর বলল, এতক্ষণে বুঝলাম। একটা শেয়াল তার বাসাটা খালি রেখে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। তুমি চড়ুইয়ের তাড়া খেয়ে সেই বাসায় ঢুকে পড়েছ।

তপস্বীর কথা শুনে কপিঞ্জল ও খরগোশ এক সঙ্গে হেসে উঠল। তারা বলল, আপনি দেখছি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এবারে ভালো করে শুনুন।

বেড়াল-তপস্বী আঁতকে ওঠার ভান করে বলল, কী বলছো! কানটা তাহলে একেবারেই গেল বুঝি! কানেরও আর দোষ কী! বুড়ো তো কম হই নি! তাহলে আর একটু কাছে এসো বাপু। একজন বসলো আমার ডান কানে, অন্যজন বাঁ দিকে। দু'জনে দু'দিক থেকে বলতে থাকলে ঠিক কানে যাবে। এক জনের না শুনলেও অন্যজনের শুনতে পাব। পরে অন্যেরটা না হয় আবার শুনব। তাহলে সরে এসো, গোড়া থেকেই সব বলো বাপুরা।

তাই শুনে খরগোশ ও কপিঞ্জল দু' দিক থেকে বেড়ালের দিকে এগিয়ে এল। তার যেই না কাছাকাছি এল তাদের বলারও সুযোগ দিল না। চড়ুইয়ের ধরল টুঁটি, দুই থাবায় খরগোশকে। তারপর আর কী!

হরিদত্ত ও ক্ষেতের সাপ

এক গরিব বামুন, তার নাম হরিদত্ত। বউ আর এক ছেল সোমদত্তকে নিয়ে সংসার। বাপের আমলের সামান্য জমি পেয়েছিল হরিদত্ত। ফসল হলে ঠিকমতো খেয়ে-দেয়ে দিন কেটে যেত। কিন্তু মানুষটা বড় দুর্ভাগা। জমি থেকে কিছুই তেমন পায় না। হয় পোকায় খেয়ে, নয়তো হনুমানে খেয়ে, অথবা ঝড়-বৃষ্টিতে সব ফসল নষ্ট করে ফেলে। কিছুতেই সে সংসার চালাতে পারে না।

একবার দুপুরে ক্ষেতে কাজ করার সময় হরিদত্ত উই ঢিবির ভিতরে এক ভয়ঙ্কর সাপ দেখতে পেল। দেখে সে ভাবল, এ নিশ্চয়ই তার ক্ষেতের দেবতা, জমির রক্ষক। একে তো সে কোনো দিন পুজো দেয় নি! তাই বোধ হয় চাষে কিছু ফলন হয় না। আজ পুজো দেব।

এই ভেবে তক্ষুণি সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে খানিকটা দুধ চেয়ে এনে মাটির সরাতে করে গর্তের কাছে রেখে বলল, আমি জানতাম না তুমি এখানে আছ। তাই পুজো করি নি। এখন থেকে প্রতিদিন তুমি পুজো পাবে। এই বলে দুধটুকু রেখে চলে গেল।

পরদিন সরাটি নিতে এসে দেখে তাতে একটি সোনার মোহর। খুশিতে গদগদ হয়ে সে মোহরটি নিল। মনে মনে ভাবল ক্ষেতের দেবতা প্রসন্ন হয়েছে। তাই তার এই পাওনা হল। সেই থেকে প্রতিদিন সে দুধ দেয় আর একটি করে মোহর পায়। এভাবে তার অবস্থা ফিরে গেল।

একদিন দরকারি কাজে হরিদত্ত অন্য গ্রামে গেল। যাবার আগে সোমদত্তকে বলে গেল উই ঢিবিতে দুধ দিতে যেতে। সব কথা সে ছেলেকে খুলে বলল।

বাপের কথামতো ছেলে দুধ রেখে এল। পরদিন ছেলে গিয়ে মোহরটি তুলে নিল, সাপটিও নজরে পড়ল। সে ভাবল, উই ঢিবি নিশ্চয়ই সোনার মোহরে ভরা। সাপ সেই মোহর পাহারা দেয়। দুধ খেয়ে খুশি হয়ে প্রতিদিন সরায় একটি করে মোহর রেখে দেয়। সাপটাকে মেরে ফেলতে পারলে সব মোহর একবারে পাওয়া যাবে।

এই ভেবে পরদিন দুধ নিয়ে যাবার সময় একটা শক্ত লাঠিও সঙ্গে নিল। দুধটুকু রেখে সে এক পাশে আড়ালে লুকিয়ে রইল।

একটু পরে সাপ ঢিবির গর্ত থেকে বেরিয়ে এল দুধ খেতে। সঙ্গে সঙ্গে সোমদত্ত মারল লাঠির বাড়ি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সে ঠিকমতো ঘা মরতে পারল না। সাপও ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল। লাঠি পড়ল মাটিতে আর সামান্য ঘা খেল গায়ে। প্রচণ্ড রাগে সাপটা ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করে মারল এক ছোবল। ছোবল পড়ল সোমদত্তের পায়ে। সাপের তীব্র বিষে সে মাটিতে ঢলে পড়ল। তারপর সেখানেই মরে পড়ে রইল।

পরদিন বাড়িতে ফিরে হরিদত্ত দুঃসংবাদটা পেল। আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে ছেলের সৎকার করল। হরিদত্তের বুক ভেঙে গেল শোকে। কোনো মতে শোক সামলে পরের দিন সাপের জন্য দুধ নিয়ে গেল।

সরা রেখে হাত জোড় করে বলল, হে দেবতা, এমন কাণ্ড যে ঘটবে আমি বুঝতে পারি নি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। প্রসন্ন হও। আর কখনো এমনটি হবে না।

অনেকক্ষণ পরে সাপ গর্ত থেকে সামান্য মাথা বের করে বলল, হে ব্রাহ্মণ, এখনো তোমার ছেলের চিতার আগুন নেভে নি। এর মধ্যে ছেলের শোক তুচ্ছ করে মোহরের লোভে আমার কাছে এসেছ? তোমার ছেলে অকারণে আমাকে লাঠির ঘা মারল। আমিও তাকে ছোবল মেরেছি। লাঠির ঘা আমি ভুলতে পারব না, তুমি তোমার ছেলে হারানো দুঃখ কোনো দিন ভুলতে পারবে না।

এই বলে সাপ একটি বহু মূল্যবান হীরে হরিদত্তের দিকে ছুঁড়ে দিল। আর বলল, এটি নিয়ে যাও। এই শেষ, আর কখনো তুমি এসো না।

হীরেটা নিয়ে হরিদত্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ছেলের বুদ্ধির দোষেই আমি সব হারালাম, বলতে বলতে সে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

লব্ধ-নাশ

পেয়ে হারানোর নাম হল লব্ধ-নাশ। যে জিনিস ছিল না তা পাওয়া গেল, এবং পেয়েও তা রাখা গেল না বলতে লব্ধ-নাশ বোঝায়।

পাওয়া ধন অনেক সময় মানুষ ধরে রাখতে পারে না। হয় বোঝার ভুলে, নয়তো বুদ্ধির দোষে, অথবা কারুর প্ররোচনায় পাওয়া ধন হারাতে হয়। এভাবে পেয়ে হারানোর দুঃখ গভীর। ধন হল দরকারি এবং হিতকরী। এমন ধন কী করলে নিজের করে রাখা যায়, কী করলে সেই ধন হারানোর ভয় থাকে না, কোন গুণে তা চিরকাল ধরে রাখা যায়–এই বিষয় নিয়েই পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ তন্ত্র রচিত!

কুমোর যুধিষ্ঠির ভাগ্যগুণে রাজার সেনাপতি হয়েছিল। কিন্তু সে তো যুদ্ধবিদ্যা জানে না, কোনো দিন যুদ্ধও করে নি। একথা রাজা জানতে পারলে কুমোরকে সেনাপৈত্য থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবার এক কুমির ও বানরের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায় কুমিরের নির্বুদ্ধিতার জন্য। বুদ্ধির দোষে কুমির তার প্রাণের বন্ধুকে হারাল।

কুমোরের যুদ্ধযাত্রা

এক

ছিল কুমোর। তার নাম যুধিষ্ঠির। তার তিন কুলে কেউ ছিল না। তবুও নিজের জন্য কিছু তো করতে হয়। তাই সে চাক ঘুরিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, মালসা ও সানকি বানাত। হাটের দিন বিক্রি করত, তাতে তার একার সংসার ভালোই চলত।

একদিন হাটের থেকে ফিরতে তার রাত হয়ে গেল। বন্ধুদের সঙ্গে হাটে আড্ডা মারছিল। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না, সেও বোধ হয় কোথাও দূরে তারাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠির ফেরার পথে পড়েছিল বেওয়ারিশ কুকুরের পাল্লায়। তাদের তাড়া খেয়ে কোনোরকমে দৌড়ে উঠোনে ঢুকল। উঠোনের এক কোণে ছিল ভাঙা হাঁড়ি-পাতিলের স্তূপ। অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ল তার উপর। হাত-পা মেলে পড়ল। কপাল পর্যন্ত ঠুকে গেল।

আচমকা চোটটা ভালোই লেগেছিল। কপাল কেটে গিয়ে একেবারে রক্তারক্তি। কোনো রকমে উঠে ঘরে গেল। কপালের কাটা শুকোতে লাগল অনেক দিন। শেষে ঘা শুকোল বটে, রেখে গেল চিরস্থায়ী গভীর দাগ।

তারপরও দিন কাটছিল ভালোই। কিন্তু হঠাৎ দেশে এল আকাল, দুর্ভিক্ষ। খেতে না পেয়ে লোক মরতে লাগল। অনেকে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাল। কাতারে কাতারে চলল ভুখার মিছিল।

একদিন যুধিষ্ঠিরও গাঁয়ের এক দল লোকের সঙ্গে চলে এল অচেনা এক দেশে। সেখানে আকাল নেই। সুখী লোকজন। সাজানো-গোছানো ঘরবাড়ি ও দোকান-পসরা। দেখে যুধিষ্ঠিরের তাক লেগে গেল। সে ভাবল, এলাম যখন, এ দেশেই থাকব। কাজকর্ম কিছু একটা পাওয়া যাবেই।

এই ভেবে একদিন সে রাজার কাছে উপস্থিত হল কাজের জন্য। রাজা তখন পাত্রমিত্র নিয়ে দরবারে বসেছেন। তাঁর দু' পাশে নির্দিষ্ট আসনে বসেছে দুই

রাজপুত্র। তারা রাজকাজ শিখছে। সেদিন রাজার মন ছিল খারাপ, তাই মুখ ভার। দিন কয়েক আগে ছোট সেনাপতি মারা গেছে। যুধিষ্ঠিরের কথা রাজা শুনলেন।

যুধিষ্ঠিরের শরীর ছিল তাগড়া, তেমনি লম্বা, তার উপর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। তবে পথের ধুলোয় ও ক্লান্তিতে শরীর ছিল একটু মলিন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজার প্রথমেই নজর পড়ল যুধিষ্ঠিরের কপালের গভীর দাগটার উপর। তিনি ভাবলেন, এরকম শক্তপোক্ত লোক দেখছি, তার উপর কপাল জুড়ে সামনাসামনি লড়াইয়ের গভীর দাগ। এ লোক বীরপুরুষ না হয়ে যায় না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এর বংশ ও জাতের পরিচয়। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী কোনো রাজপুত্র।

এই ভেবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, তোমার উপযুক্ত কাজই তুমি পাবে। আজ থেকে তুমি ছোট সেনাপতির পদে বহাল হলে।

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রভুর আদেশ, মহারাজ।

অচেনা-অজানা একজনকে সেনাপতির পদে বহাল হল দেখে বৃদ্ধ মন্ত্রী, পাত্রমিত্র সবাই আরো অবাক! কিন্তু রাজার মুখের উপর তো কিছু বলা চলে না। দুই রাজপুত্রও কম বিরক্ত হল না।

ছিল হাঁড়ি-পাতিল গড়ার কুমোর, অন্য দেশে বরাত জোরে হয়ে গেল একেবারে সেনাপতি। ছোট সেনাপতি কী কম! এমন তার আর কোনো অভাব নেই। অর্থ, সম্পদ, প্রতিপত্তি, সাজানো বাড়ি সব পেল। বাড়ি ভর্তি দাসদাসী। গায়ে জমকালো পোশাক। মাথায় সেনাপতির পাগড়ি। কোমরে লম্বা চকচকে তরবারি ঝুলিয়ে রাজসভায় বসে। মাস গেলে মোটা মাইনে। রাজা নিজেই তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলেন।

এমনি সুখের দিনে হঠাৎ একদিন শত্রু এসে হানা দিল রাজ্যে। ব্যস, রাজ্য জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্রে শান দিতে লাগল সৈন্যরা। তারপর সবাই প্রস্তুত লড়াই করতে।

যুদ্ধের সময় রাজার দরকার গোপন পরামর্শ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ডাকলেন। যুধিষ্ঠির এলে রাজা বললেন, রাজপুত্র, আমি ভাবছি এই যুদ্ধে তোমাকেই সেনাপতি করে পাঠাব। তা এতদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। বলো তো, কোন যুদ্ধে তোমার কপালের ওই দাগটা হয়েছিল?

যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে বলল, মহারাজ, ওটা কোনো অস্ত্রের দাগ নয়। আমি আসলে এক কুমোর। আমার নাম যুধিষ্ঠির। বাড়ির উঠোনের কোণে অনেক হাঁড়ি-পাতিল ভাঙা জমা পড়ে ছিল। এক অন্ধকার রাতে বেওয়ারিশ কুকুরের তাড়া খেয়ে ওখানে পড়ে গিয়ে কপালে চোট লাগে। সেই কাটা দগদগে ঘা হয়ে শেষে এই দশা।

শুনে রাজা থ। লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট। কিন্তু তিনি তো রাজা, নিজেকে সঙ্গে

সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন, আমারই ভুল হয়েছে। আগে তোমার পরিচয় কোনো দিন জানতে না চেয়ে। তা যা হবার হয়ে গেছে। তুমি এবার এসো। আমি যুদ্ধের জন্য অন্য সেনাপতি দেখছি।

যুধিষ্ঠির সাহসে ভরে বলল, মহারাজ, আপনি মিছে ভয় পাচ্ছেন। যুদ্ধটা করতে দিন, তখন বুঝবেন আমার হাতের কৌশল ও কায়দা।

রাজা বললেন, দেখো যুধিষ্ঠির, তুমি দেখতে ভালো, তোমার শক্তি ও সাহস সবই আছে মানছি। কিন্তু যে বংশে তুমি জন্মেছ সেই বংশে কেউ কখনো যুদ্ধ করে নি, সেনাপতিও হয় নি। তুমি এবারে তোমার পথ দেখে নাও। রাজপুত্ররা তোমার পরিচয় জানতে পারলে লাঞ্ছনার শেষ খুঁজে পাবে না।

সে দিনই যুধিষ্ঠির সেই দেশ ছেড়ে পালাল।

পঞ্চতন্ত্রের বচন

১. প্রশ্ন করে যে জানতে চায়, শোনে, জানে এবং সবসময় তা মনে রাখে সেই হতে পারে জ্ঞানী।
২. ভালো করে দেখে শুনে জেনে—অর্থাৎ পরীক্ষা না করে কোনো কাজ করলে শেষে অনুতাপ করতে হয়।
৩. অন্যের ক্ষতি করাই দুষ্ট লোকের স্বভাব। নিজের নাক কেটেও তারা পরের যাত্রা ভঙ্গ করে দেবে।
৪. সর্বস্ব গেছে, এমনকি প্রাণও যেতে বসেছে, এমন অবস্থায় নীচ শত্রুর কাছেও নত হয়ে ধনপ্রাণ রক্ষা করতে হয়।
৫. যে খাদ্য খাওয়ার উপযুক্ত, সহজে হজম ও হজমে উপকার হয়, তেমন খাবারই খেতে হয়।
৬. ভালোবাসার ছয়টি লক্ষণ—গোপন কথা বলে, গোপন কথা জানতে চায়, উপহার দেয়, উপহার গ্রহণ করে, খায় এবং খাওয়ায়।
৭. নিশ্চিত ছেড়ে যে অনিশ্চিতের পেছনে ছোটে তার নিশ্চিত-অনিশ্চিত দুইই যায়।
৮. চোখের সামনে খারাপ কাজ ঘটতে দেখলেও মিষ্ট কথায় মূর্খ তা ভুলে যায়।
৯. কয়লা শত ধুয়েও ময়লা যায় না, তেমনি শত বোঝালেও দুরাত্মার কুকর্ম বন্ধ হয় না।
১০. উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পদ থেকে কেউ যদি জোর করে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে সে তার জন্মশত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রিয় হলেও তাকে উচ্ছেদ করতে হয়।
১১. গুণীর পরিচয় তার গুণ। জাত ধর্ম বর্ণ দিয়ে কিছু যায় আসে না।
১২. মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। শতপতি চায় হাজারপতি হতে, হাজারপতি চায় লক্ষপতি হতে। লাক্ষপতি চায় রাজত্ব। রাজা পেতে চায় স্বর্গ।

শেয়াল-শাবক ও সিংহ-শাবক

সিংহী ও সিংহ থাকত এক বনে। তাদের ছিল দুটি বাচ্চা। সকালে সিংহ শিকারে বেরিয়ে যায়। কোনো দিন নিয়ে আসে হরিণ, কোনো দিন খরগোশ, ছাগল ও শুয়োর কত কিছু। এনে দেয় সিংহীর কাছে। তারপর বাচ্চা-দুটো নিয়ে এক সঙ্গে খায়। বড় কিছু পেলে কয়েক দিন চলে যায়।

একদিন শিকারে বেরিয়ে সিংহ সারা দিন কিছুই পায় নি। শেষে পেল শেয়ালের একটি বাচ্চা। সিংহ সেটাকে মারল না। মুখে আলতো করে কামড়ে ধরে জ্যান্ত নিয়ে এল। সিংহীকে দিয়ে বলল, আজ অন্য কিছু পেলাম না। বাচ্চা বলে এটাকে মারতে পারি নি। তুমি যা করার করো।

সিংহী বলল, তুমি যাকে মায়া করে মারতে পারলে না, আমি তাকে কোন প্রাণে মারি! ও থাকুক। আমাদের ছানাপোনাদের সঙ্গে মানুষ হোক। ওদের খেলার সাথী হবে।

তারপর তার বাচ্চাদের ডেকে বলল, শোন আমার আদরের ছানাপোনারা, তোদের একটা ভাই এনেছে তোদের বাবা। তার সঙ্গে খেলবে-দেলবে। ভাইয়া ডাকবে।

সিংহীর ছানাদের শেয়াল-টেয়াল বোঝার বয়স হয় নি। তাই তারা আর একজন ভাই পেয়ে খুব খুশি। খিদে-টিদে সে দিনের মতো ভুলে গেল। খেলাতেই দিন কাটল।

দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে সিংহীর ছানারা বড় হয়ে উঠল। তারা এখন একা একা একটু এদিক-ওদিক যায়। বেড়িয়ে আসে। একদিন বেড়াতে গেছে ওরা। হঠাৎ সামনে পড়ল একটা হাতি। ইয়া বড় বড় কান, বড় দুটি দাঁত। শুঁড় দিয়ে টেনে গাছের ডাল ভেঙে পাতা খাচ্ছে। হাতি দেখে সিংহীর বাচ্চাদের সে কী তর্জন-গর্জন! থাবা বাগিয়ে দু' জনে তাড়া করতে যায় আর কী!

এত বড় প্রাণী দেখে শেয়ালের প্রাণ যায় যায়! সে ভাইদের থামিয়ে বলল, সর্বনাশ, এত বড় হাতিকে তেড়ে যাচ্ছিস কী! মরবি যে! পালা শিগ্‌গির।

এই বলে সে নিজেই সবার আগে চোঁ-চাঁ দৌড়। দাদাকে পালিয়ে যেতে দেখে সিংহীর ছানাদের আর উৎসাহ রইল না। তারাও ছুটে গুহায় চলে এল। এসে মা-বাবার সামনে ভাইয়ার কীর্তি বলে খুব হাসতে লাগল।

তা শুনে শেয়ালছানা তাদের এই মারে তো এই মারে। সিংহী তাদের থামাল। তারপর শেয়ালছানাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, বাছা, ওরা তোমার ছোট ভাই, কী

সকালে সিংহ শিকারে বেরিয়ে যায়। কোনোদিন নিয়ে আসে হরিণ, কোনোদিন খরগোশ।

বলতে কী বলেছে, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আছে? ভায়ে-ভায়ে এমন করে না।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শেয়ালছানা বলল, ওরা আমাকে নিয়ে এতো হাসি-ঠাট্টা করবে কেন? ওদের ভালোর জন্যই তো মানা করেছি। ওদের চেয়ে আমি কম কিসে? আমি ওদের চেয়ে দেখতে খারাপ, নাকি সাহস কম, না আমার গায়ে বল কম? আর আমি তো ওদের চেয়ে বড়। আমাকে মান্যি করবে না?

সিংহী হেসে বলল, বাছা, তোমার সাহস বল কোনোটাই কম না। দেখতে তুমি খুব ভালো। তবে কী জানো, তুমি যে বংশে জন্মেছ সেখানে কেউ কোনো দিন হাতি মারে নি। হাতির মতো বড় প্রাণী মারার সাহসও তাই তোমার বংশের নেই।

শেয়ালছানা বলল, তবে কি আমি তোমার ছেলে নই? তুমি আমার মা নও?

সিংহী এবার শেয়ালছানাকে গুহার এক পাশে আরো আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, না বাছা, তুমি জন্মেছ শেয়ালের ঘরে। আমার ছানাদের বাবা তোমাকে না মেরে আমাদের ঘরে নিয়ে আসে। তুমি সেই থেকে আমাদের ঘরে বড় হচ্ছ। আমার দু' ছেলের কেউ এ কথা জানে না। এখন বড় হচ্ছে ওরা, আমরা না বললেও একদিন তোমার ব্যবহারে ঠিক জেনে যাবে। তখন তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। আর এসব কথা তুমি যখন জানতে পারলে, আজই পালিয়ে তোমার জাতের লোকদের কাছে চলে যাও।

সিংহীর কথা শুনে শেয়ালছানা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরে ভয়ে ভয়ে গুহার বাইরে এসে দৌড়ে বনে উধাও হয়ে গেল। পেছনে একবারও ফিরে তাকাল না।

কুকুর চিত্রগা

সেই গ্রামে বাস করত অনেকগুলো কুকুর। তাদের কোনো প্রভু ছিল না। বেওয়ারিশ। পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরেই দিন কাটত। হাট-বাজার এখানে-ওখানে যা পেত খেয়ে পেট ভরাত।

একবার সেই দেশে হল আকাল। গাঁয়ের লোকেরা না খেতে পেয়ে মরা পড়তে লাগল। পথের কুকুরদেরও সেই দশা। খাবার আর মেলে না। মড়া মানুষ খেয়ে তাদের চলতে লাগল।

কুকুরদের মধ্যে একজনের নাম চিত্রগা। তার গা ছিল সাদা-কালো রঙ। সে একদিন সঙ্গীদের কাউকে কিছু না বলে সেই গ্রাম ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল। সেখানে সে দেখল খাবার-দাবারের কোনো অভাব নেই। লোকজন হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছে। সুযোগ বুঝে সে পথের পাশের এক বাড়িতে টুক করে ঢুকে পড়ল।

এক ঘোমটা পরা বউ দাওয়ায় বসে মুখ নিচু করে আপন মনে চাল বাছছিল। ঘরের দরজা ছিল খোলা। চিত্রগা ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল। দেখল বউটা তার দিকে তাকাচ্ছে না। ঘরে অন্য মানুষও নেই। সাহস করে সে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তারপর আর কী! অনেক দিন পরে পেট ভরে ভালোমন্দ খেয়ে মুখ চাটতে চাটতে বেরিয়ে এল। তখনও বউটি তাকে খেয়াল করল না।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই পড়ল এলাকার কুকুরের দলের মুখে। তারা ঘেউ ঘেউ করে ঘিরে ধরল চিত্রগাকে। বেচারি, একা, একজন। এতগুলো কুকুরের সঙ্গে পারবে কেন? আঁচড় কামড় খেতে খেতে তার অবস্থা নাস্তানাবুদ। কোনো মতে লেজ গুটিয়ে দৌড়ে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকে প্রাণ বাঁচাল।

দেখা গেল সেই দেশের বউ-ঝিয়েরা তেমন সাবধানী নয়। কুকুর-বেড়ালের দিকে খুব একটা খেয়াল রাখে না। আছেও তাদের অঢেল। খাবার-দাবার ভালো,

একটা ঘোমটা পরা বউ দাওয়ায় বসে মুখ নিচু করে আপন মনে চাল বাছছিল।

খেতে-খামারে হয়ও খুব। কিন্তু হলে কী হবে। খাবার জুটলেও দু' এক দিন পর পর চিত্রগাকে এলাকার কুকুরের পাল্লায় পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়। কপালে জোটে বেধড়ক আঁচড় ও কামড়।

এভাবে আর কাঁহাতক পারা যায়। জাত-ভাইদের হাতেই জোটে দুর্ভোগ। একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সে। সারা গা ব্যথা। এখানে-ওখানে ঘা, রক্তের দাগ। শেষমেশ একদিন। ভালো খাবারের নিকুচি করি বলে সেই দেশ ছেড়ে ফের নিজের দেশের পথে পা বাড়াল।

সে ভাবল, দুর্ভিক্ষ হোক, যাই হোক। নিজের দেশে নির্ভয়ে থাকা অনেক ভালো। নিজের দেশের জাত-ভাইয়েরা সবাই তো তাকে চেনে, জানে। তেড়ে-ফুঁড়ে তো আর কামড়াতে আসবে না? আর তেমন হলে কেউ-না-কেউ তার দলে থাকবে, তার পক্ষ নেবে।

চিত্রগাকে ফিরে আসতে দেখে পুরনো সাথিদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল, ছুটে এসে তাকে দেখতে এল। সে বেঁচে আছে জেনে সবাই এক চোট ঘেউ ঘেউ করে খুশি প্রকাশ করল। সেও মুখ তুলে ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে ঘেউ ঘেউ করল। বুকটা হালকা হয়ে গেল। এত দিনে বুঝতে পারল স্বাধীনতা কী!

তারপর সঙ্গীরা জানতে চাইল নতুন দেশটা কেমন, কত দূরে। আর একজন বলল, কী ভাই, বিদেশে ছিলে কেমন? খাবার-দাবার অমিল নয় তো? লোকজনের

চাল-চলন কেমন ধারা? আর জাতভায়েরা কেমন?

অনেকগুলো প্রশ্ন শুনে চিত্রগা বলল, রাখো রাখো। একটা একটা বলি। কিন্তু বিদেশের কথা বলব কী! খাবার-দাবার অঢেল। বউ-ঝিয়েরাও ভালো, অসাবধান। ঘরে ঢুকে হাঁড়ি ভাঙলেও কেউ খেয়াল করে না। আমি তো তাজ্জব। আর বিলে ধান-মাছ, গরু-বাছুর অঢেল।

সত্যি!

সত্যি হয়ে কী লাভ? সেখানকার জাতভায়েরা হল শত্রু। শুধু শত্রু না, মহা শত্রু। তাদের উৎপাতে টিকতে না পেরে নিজের দেশে ছুটে এলাম। এখানে অল্প-স্বল্প যা জোটে তাতেই সই। উপোস দেব তাও-ভি আচ্ছা। তবুও নিজের দেশ ভালো। দেশের মাটিতে নিশ্চিন্তে শোয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্রের বচন

১. হিতৈষী মূর্খের চেয়ে বুদ্ধিমান ও বিদ্বান শত্রু ভালো।

২. বন্ধুর যে অনিষ্ট করে, যে উপকারীর উপকার ভুলে যায়, সে বিশ্বাসঘাতক, তার ধ্বংস অনিবার্য।

৩. ভয়, আনন্দ বা দুঃখ-যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা যে তলিয়ে দেখে এবং হুট করে কিছু করে বসে না, তাকে অনুতাপ করতে হয় না।

৪. কিছু কথা গোপন করতে হয় স্ত্রীর কাছে, কিছু কথা আত্মীয়-স্বজনের কাছে, কিছু বন্ধু-বান্ধবের কাছে, কিছু ছেলে-মেয়ের কাছে। বিচক্ষণ লোক কথা বলে খুব ভেবে-চিন্তে।

৫. বুদ্ধিমান লোকই প্রকৃত বলবান। বুদ্ধি ছাড়া বিদ্যাও বিফল হয়। বুদ্ধিহীন লোক দুর্বল। উঠতি শত্রু বা ব্যাধি শুরুতেই নির্মূল করতে হয়। নইলে বেড়ে গিয়ে মহা বলবানকেও এরা ধ্বংস করে।

৬. মুখের ভাব, ইশারা-ইঙ্গিত, চলা ও বলা, নড়াচড়া, মুখ-চোখের ভাব বদল-এসব দেখে মানুষের আসল পরিচয় জানা যায়।

৭. হিতৈষী, সাধুচরিত্র, বুদ্ধিমান এবং নিয়ম-নীতি জানা ব্যক্তি বা শাস্ত্রবিদ চিন্তা-ভাবনা করে যে নীতি স্থির করে তা কখনো ব্যর্থ হয় না।

৮. বিপদে যে হতবুদ্ধি হয় না সে সহজেই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে। কী সুসময়ে, কী দুঃসময়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি একই রকম থাকে। সূর্য উদয়কালে যেমন লাল, অস্তকালেও থাকে লাল।

৯. কেউ কেউ তোতাপাখির মতো ভালো ভালো কথা বলে যায়। কারো কারো বুকে থাকে, মুখে আসে না, যেন বোবা। কারো কারো আবার মাথায়ও আসে, মুখেও খেলে।

১০. বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি একবার দেখলেই অন্যের ভিতরের পরিচয় জেনে যায়। যেমন পারে নিপুণ বণিক হাতে তুললেই বস্তুর সঠিক ওজন বলে দিতে।

অপরীক্ষিত-কারক

ভালো করে না-ভেবেচিন্তে কাজ করাই হল অপরীক্ষিতকারিত্ব। আগুপিছু না ভেবে হুট করে কাজ শুরু মানেই বিপদ ডেকে আনা। এজন্য এমনকি জীবন সংশয়ও হতে পারে। আসলে কাজ করতে হয় ভালো-মন্দ বিচার করে। নিয়ম-নীতি মেনে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। আর কাজের ফল তো আছেই। এসব নিয়েই পঞ্চতন্ত্রের এই তন্ত্র।

চার বন্ধুর মধ্যে খুব ভাব। তাদের মধ্যে তিন বন্ধুর তিন বিদ্যা। তারা বিদ্যা জাহির করতে গিয়ে সিংহের কবলে পড়ে জীবন পাত করে। তাদের চতুর্থ বন্ধু এই কাজে তাদের বাধা দিয়ে থামাতে পারে নি। কিন্তু সে ছিল বুদ্ধিমান, এজন্য বিদ্যা না থাকলেও সে বেঁচে যায় বুদ্ধির জোরে। এরকম 'চার যুবক ও সিদ্ধপ্রদীপ' গল্পটিও এই সঙ্গে পড়া যাবে। চতুর্থ যুবক সন্ন্যাসীর কথা ভুলে গিয়ে সিদ্ধপ্রদীপের গুণ হারিয়ে অনন্ত দুঃখে পড়ে। মাথায় লোহার কাঁটার চক্র নিয়ে দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে থাকে।

চার যুবক ও সিদ্ধপ্রদীপ

চার যুবকের ভারি ভাব। একই গ্রামে তারা থাকত। খেলাধুলো, লেখাপড়া ও ঘুরে বেড়ানো সবই তারা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গেই করেছে। আর চারজনই গরিবের ছেলে। অভাব-অনটনের মধ্যেই যুবক হয়ে উঠেছে। এখন তাদের চিন্তা কী করে সংসারের অভাব দূর করা যায়। কী করে ধনী হওয়া যাবে।

ধনহীন হয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। সমাজে প্রতিপত্তি থাকে না। ধন ছাড়া শুধু বিদ্যার কোনো দাম নেই। ধন ছাড়া বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ ইত্যাদি সব থেকেও না থাকার সামিল। ধনহীন লোকের কথা কেউ শোনে না। এসব ভেবে ও বুঝে ঠিক করল আর তারা হাত-পা গুঁজে বসে থাকবে না। বিদেশে যাবে রোজগার করতে।

যাক তারা। দেখা যাক কী আছে তাদের ভাগ্যে। কী তাদের কর্ম।

একদিন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা চলল বিদেশে। চলল অনেক গ্রাম, নগর ও বন পেরিয়ে। কত নদী সাঁতরে পার হল, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল। শেষে এসে পৌঁছল অবন্তী নগরে।

শিপ্রা নদীর তীরে অবন্তী। নদীর তীরে মহাকালের মন্দির। চার বন্ধু নদীতে নেমে ভালো করে শরীর পরিষ্কার করল। গা ধুয়ে নিল। তারা তো বামুনের ছেলে। স্নান করে মন্দিরে পুজো দেবে।

পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সামনে পড়ল এক সুদর্শন যোগী। মাথায় তার জটা, কপালে তিন রেখার তিলক। যোগীর নাম ভৈরবানন্দ। চার বন্ধু যথাবিহিত সম্ভাষণ ও প্রণাম জানাল। দেশে থাকতেই তারা ভৈরবানন্দের নামডাক শুনেছে। অনেক অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করতে পারেন। এজন্য তারা তাঁর সঙ্গে শ্মশানের কাছে আশ্রমে চলল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আসছ তোমরা? কোথায় যাবে, কী উদ্দেশ্য?

ওরা বলল, বেরিয়েছি টাকার সন্ধানে, রোজগার করতে। অনেক অনেক টাকা

নিয়ে দেশে ফিরব নয়তো মরব। এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। আপনি দয়া করে আমাদের উপায় বলে দিন। যত কঠিনই হোক তা করতে প্রস্তুত আমরা।

তিনি বললেন, কঠিন কিছুই তোমাদের করতে হবে না। তোমাদের তো বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, তার জোরে সব পাবে। আমি তোমাদের চারটি প্রদীপ দিচ্ছি। এগুলো নিয়ে তোমরা হিমালয়ের পথে চলে যাও। যেতে যেতে যেখানে হাত থেকে প্রদীপ পড়ে যাবে সেখানে মাটি খুঁড়ে দেখবে, ধন পাবে, ধন নিয়ে ফিরে আসবে।

ওরা খুশি হয়ে বলল, তাই দিন।

তিনি বললেন, কিন্তু একটা বিষয়ে খুব সাবধান। এক ধ্যানে নিয়ে চলবে, মন যেন চঞ্চল না হয়, কলুষিত না হয়। তা হলেই প্রদীপের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

চার বন্ধু চারটি প্রদীপ নিয়ে হিমালয়ের পথে পাড়ি দিল। যেতে যেতে এক জায়গায় এসে একজনের হাত থেকে প্রদীপ পড়ে গেল।

অমনি সে কাঁধের ঝোলা-ঝুলি নামিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির নিচে পেল তাল তাল তামা। তামার পাহাড়। সে তখন বন্ধুদের ডেকে বলল, তোমরাও এসো, যত খুশি তামা তুলে নিয়ে যাই। এখানে অঢেল তামা।

তিন বন্ধু বলল, তামা দিয়ে কী হবে? অনেক তামা দিয়েও অভাব ঘুচবে না। আমরা আরো এগিয়ে গিয়ে দেখতে চাই। দেখি ভাগ্যে কী আছে। সে বলল, তোমরা যাও, আমি তামা নিয়েই ঘরে ফিরে যাব।

তিন বন্ধু এগিয়ে চলল। তিনদিন তিন রাত পরে ওরা এসে পৌঁছল এক ঝরনার পাশে। তখন আগের বন্ধুর হাত থেকে পড়ে গেল প্রদীপ। অমনি সে সেখানে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। একটুখানি খোঁড়ার পর দেখতে পেল তাল তাল রুপো, রুপোর পাহাড়। আনন্দে সে চিৎকার করে উঠল। বন্ধুদের ডেকে বলল, বন্ধুগণ, আর এগিয়ে গিয়ে কাজ নেই। এখান থেকে যত খুশি রুপো নিয়ে ঘরে ফিরে চলো।

বাকি দু' জন বলল, বোকার মতো কথা বলো না। প্রথমে পাওয়া গেল তামা, তারপর রুপো। পরে নিশ্চয়ই সোনা পাওয়া যাবে। আমরা এগিয়ে চললাম। আর যে রুপো পেল সে যতটা সম্ভব রুপো নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

বাকি দুই বন্ধু চলল। যেতে যেতে একজনের হাতের প্রদীপ পড়ে গেল। অমনি সে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। দেখে মাটির নিচে সোনার খনি। তাল তাল সোনা। সে চতুর্থ বন্ধুকে বলল, এখান থেকে যত পার নাও। এতে আমাদের দুঃখ ঘুচে যাবে।

চতুর্থজন বিরক্ত হয়ে বলল, তোমরা বড় অল্পে তুষ্ট মানুষ। বুঝতে পারছ না কেন প্রথমে তামা, তারপর রুপো, তারপর সোনা। এবার আমার প্রদীপ থেকে নিশ্চয়ই মণি-মাণিক্য বা রত্ন পাওয়া যাবে। এত সোনা নেওয়াও কষ্ট, সোনা বড্ড ভারি।

তৃতীয় বন্ধু বলল, ভাই, তোমার মন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। তুমি স্থির হও। ভালো করে ভেবে দেখো। চলো, সোনা নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। এসো।

দেখে এক অদ্ভুত লোক। রক্তে তার গা ভেসে যাচ্ছে। মাথার উপর ঘুরছে কাঁটাওয়ালা এক লোহার চক্র।

চতুর্থ বন্ধু বলল, না ভাই, এতে আমার পোষাবে না। থাকো তুমি সোনা নিয়ে। আমি চললাম।

তৃতীয় বন্ধু বলল, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

চতুর্থ চলল একা। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। খিদেয় পেট জ্বলছে। রোদের তাপে গায়ের চামড়া ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন ও খিদেয় জর্জরিত হয়ে এক গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। মনও খুব চঞ্চল, কোন দিকে যাবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে সে আবার চলতে শুরু করল। ঘুরতে ঘুরতে সে এক জায়গায় এসে দেখে এক অদ্ভুত লোক। রক্তে তার গা ভেসে যাচ্ছে। মাথার উপর ঘুরছে কাঁটাওয়ালা এক লোহার চক্র।

সে কাছে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, দাদা, আপনার মাথায় ওটা কী, আপনি কে? বলতে পারেন এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে?

বলতে বলতেই লোকটার মাথার চক্র যুবকের মাথার উপর এসে ঘুরতে লাগল। চক্রের লোহার কাঁটায় তার চামড়া কেটে মাথা থেকে দর দর করে রক্ত ঝরছে।

যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে বলল, এ কী করলে তুমি? আমার এমন সর্বনাশ কেন করলে?

লোকটি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে বলল, তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে

নিলে। যেমন আমিও করেছিলাম। সিদ্ধপ্রদীপ হাতে নিয়ে অর্থের সন্ধানে আমিও এখানে এসেছিলাম। সেই রাজা রামচন্দ্রের সময়ে। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর কালে।

অতি লোভে আমার মন চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তাতে সিদ্ধপ্রদীপের গুণ যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারি নি। সাধুর সাবধান বাণী মনে রাখি নি। তখন আমি চাকা মাথায় আর একজন লোককে এখানে দেখেছিলাম। তাকে কষ্ট পেতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ব্যস, তখুনি আমার মাথায় এসে পড়ল চক্রটা। সেই থেকে যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি আমি, আজ তুমি এসে আমাকে উদ্ধার করলে।

যুবক তখন বলল, আমাকে এভাবে যন্ত্রণা নিয়ে কাটাতে হবে? তেষ্টার পানি, পেটের ভাত কোথায় পাব?

লোকটি বলল, ভাই, ধনের দেবতা কুবের এই ব্যবস্থা করেছেন। ভয় দেখাবার জন্য এই চক্র ছেড়ে দিয়েছেন, নইলে তাঁর রত্ন ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে। এই চক্রের ভয়ে কেউ এদিকে আসে না, যদি কেউ এসেও থাকে তার খিদে থাকবে না, তেষ্টা থাকবে না, ঘুম চলে যাবে, মৃত্যু হবে না, সে শুধু কষ্ট ভোগ করবে। কষ্ট আর কষ্ট। এত দিনে আমি মুক্ত হলাম। বিদায় বন্ধু, আমি চললাম। এই বলে লোকটি বনের পথে চলে গেল।

এদিকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে করতে তৃতীয় বন্ধু, যে সোনা পেয়েছিল, সে চতুর্থ বন্ধুকে খুঁজতে বের হল। অনেক পথ ঘুরে সে এক দিন চতুর্থ বন্ধুর কাছে এসে পৌঁছল। দেখে রক্তে তার গা ভেসে যাচ্ছে, মাথার উপর ঘুরছে কাঁটাওয়ালা সেই লোহার চক্র। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যন্ত্রণা ভোগ করছে।

বন্ধুর যন্ত্রণা দেখে সে কেঁদে ফেলল। বলল, ভাই, একী ব্যাপার? কী করে তোমার এমন হল?

তার বন্ধু বলল, সবই বিধির বিধান। কর্ম। তারপর সে সব ঘটনা আগাগোড়া বর্ণনা করল।

তৃতীয় বন্ধু তখন বলল, আমি কত বারণ করলাম। অনুরোধ করলাম সোনার পাহাড়ের ভাগ নিতে। তুমি আমার কথা শুনলে না। নিজের বুদ্ধির দোষে পেয়েও সবকিছু হারালে। এখন আমি বুঝলাম, বিদ্বান হলেই শুধু হয় না, বিদ্যার গুণের সঙ্গে দরকার বুদ্ধির মিলন। বুদ্ধি না থাকলে, অত্যন্ত লোভী হলে তার কোনো উন্নতি নেই, সবই মিথ্যে। তোমাকে এভাবে এখানে রেখে গিয়ে আমি শান্তি পাব কী করে!

লোহার ক্ষুরচক্র নিয়ে চতুর্থ বন্ধু তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

এরপর বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তৃতীয় বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে গেল।

চার বন্ধু ও মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা

চার বন্ধু। তাদের নাম লব্ধবিদ্য, কৃতবিদ্য, অশেষবিদ্য ও সুবুদ্ধি। প্রথম তিনজন প্রচুর লেখাপড়া করে নানা বিদ্যা শিখে হল পণ্ডিত। কিন্তু হলে হবে কী, ঘটে তাদের বুদ্ধি বলতে কিছু ছিল না। আর সুবুদ্ধি লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হল না বটে, সে ছিল তুখোড় বুদ্ধিমান।

চার বন্ধু মিলে একদিন পরামর্শ করল তারা পুব দেশে যাবে। সেখানে গিয়ে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে। তাই হল। একদিন সকলে মিলে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রওনা দিল।

যেতে যেতে অনেকখানি পথ পার হল। তখন লব্ধবিদ্য বলল, হ্যাঁ ভাই, একটা কথা মনে পড়ল। দেখো, সুবুদ্ধিটা শুধুই বুদ্ধিমান, লেখাপড়া কিছুই জানে না। বিদ্যে ছাড়া শুধু বুদ্ধি দিয়ে সে কী করবে? রোজগার তো করতে পারবে না। মাঝখান থেকে আমাদের কষ্টের উপার্জনে ভাগ বসাবে। ও বরং বাড়ি ফিরে যাক।

শুনে কৃতবিদ্য বলল, কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। ওর ফিরে যাওয়াই ভালো।—এই বলে সে তাকে ডেকে বলল, ওহে সুবুদ্ধি, তুমি ভাই বাড়ি ফিরে যাও। তোমার বিদ্যে নেই, বিদেশে গিয়ে করবেটা কী? পেটে বিদ্যে না থাকলে টাকা রোজগার হয় না।

সুবুদ্ধি বলল, তুমি ভাই ঠিক কথাই বলেছ, আমি বিদ্যাহীন মানুষ। তোমাদের বোঝা ছাড়া তো আর কিছু নই। আমি তবে চললাম। অশেষবিদ্য তখন হাত চেপে ধরে সুবুদ্ধিকে থামাল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, এসব কী বলছ তোমরা? আমরা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলাধুলো করেছি, বড় হয়েছি, এক দেশে ছিলাম। নাইবা থাকল তার বিদ্যে, সে আমাদের বন্ধু তো বটে। তোমাদের কাছে বিদ্যে আর টাকাটাই বড় হল? বন্ধুত্বটা কিছুই নয়? ও আসুক আমাদের সঙ্গে। ওর মতো বন্ধু হয় না। আমরা যা আয় করব ভাগাভাগি করে নেব। দেখো ভাই সুবুদ্ধি, মনটা ছোট করো না। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।

কৃতবিদ্যর কথা শুনে দুই বন্ধু লজ্জিত হল। তারা বলল, তাই তো, কথাটা তো ভুল বলা হয়ে গেছে! ভাই সুবুদ্ধি, তুমি কিছু মনে করো না। আমরা সবাই এক সঙ্গে বিদেশে যাব। চলো।

সুবুদ্ধিকে আর ফিরে যেতে হলো না। তারা চারজনে পথ চলতে লাগল। যেতে যেতে এক বনের পথে তারা ঢুকল। কিছুটা গিয়ে তারা কতগুলো হাড়গোড় পড়ে আছে দেখতে পেল। বোঝা গেল একটা কোনো জন্তুর হাড়গোড় সেগুলো।

হাড়গুলোর কাছে গিয়ে লব্ধবিদ্য বলল, ভালোই হল, আমরা তিনজনে যে গুপ্তবিদ্যা শিখেছি, তা একবার পরখ করা যাবে। আমাদের বিদ্যার জোরে জন্তুটাকে বাঁচিয়ে তুলব। আমি হাড় জুড়ে দিচ্ছি।

তার তর সইছিল না। কথা শেষ করেই চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করল। দেখতে দেখতে হাড়গুলো খটাখট শব্দে জোড়া লেগে গেল। হয়ে গেল একটা কঙ্কালসার জন্তু। কিন্তু তখনো বোঝা গেল না সেটা কোন জানোয়ার।

সুবুদ্ধি এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পণ্ডিত বন্ধুদের বিদ্যার দৌড়। দেখে দেখে সে ভাবতে লাগল।

এবার তাহলে বাকিটা আমি করে দিচ্ছি—এই বলে কৃতবিদ্য মন্ত্র পড়তে শুরু করল। অমনি দেখা গেল হাড়ে মাংস-রক্ত গজাল, তারপর তার উপর চামড়া, নাক, চোখ, নোখ। সব শেষে যোগ হল কেশর। তখন দেখা গেল একটা তরতজা সিংহ মরে পড়ে আছে।

অশেষবিদ্য এগিয়ে এসে বলল, এবারে আমি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার জোর দেখাব। মন্ত্রটা পড়ছি, মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসুক।

সুবুদ্ধি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বাধা দিয়ে বলে উঠল, করছ কী, করছ কী! দেখছ না একটা সিংহ, পশুরাজ! একে বাঁচিয়ে তুললে তো আমাদের সবাইকে খেয়ে ফেলবে!

অশেষবিদ্য বলে উঠল, যেমন তোমার বুদ্ধি তেমন কথাই তো বলবে! যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এত কষ্ট করে সঞ্জীবনীবিদ্যাটা শিখলাম তা প্রয়োগ করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? তোমার তো কোনো বিদ্যে নেই তাই তুমি বাধা দিচ্ছ। বিদেশ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। দেখি, সরে দাঁড়াও।

সুবুদ্ধি বলল, ভাই মরা সিংহকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছ! তোমার বিদ্যের দৌড় দেখে বিদ্যে জিনিসটার উপর আমার শ্রদ্ধা থাকছে না। সিংহ বেঁচে উঠলে নিজেদের অবস্থা কী হবে সেটা ভাবতে পারছ না। প্রাণে বেঁচে থাকলে তোমার মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা অনেক কাজে লাগবে। এখন ওটা তুলে রাখো। ঢের হয়েছে, এখন চলা যাক। সিংহটাও মড়া পড়ে থাক।

তার কথা শুনে লব্ধবিদ্য ও কৃতবিদ্য হেসে উঠল। তারা বলল, ভাই সুবুদ্ধি, তুমি কেন ওকে বাধা দিচ্ছ? মন্ত্রের ক্ষমতা তো দেখো নি, এবার নিজের চোখে

দেখবে। সরে এসো। এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না হে। টাকা-পয়সা খরচ করে আমরা বিদ্যা শিখেছি। বুঝলে? তুমি তো কিছু শিখলে না। অন্তত মন্ত্রের ফলটা দেখে নাও।

সুবুদ্ধি বলল, মন্ত্রের ফলটা দেখতে হয়, চলো ওই গাছের ডালে বসে দেখবে। মিথ্যে কেন জীবনের ঝুঁকি নেওয়া?

তিন বন্ধু তখন বলে উঠল, তোমার যখন এত ভয়, তুমি গাছে চড়ে বসো গে। আমরা কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা পরখ করব।

সুবুদ্ধি বুদ্ধিমান। সে বন্ধুদের আবার বোঝাতে চেষ্টা করল; কিন্তু সে তো মূর্খ। তার কথা পণ্ডিত বন্ধুরা শুনবে কেন? আর মূর্খের কথায় পণ্ডিতের রাগও তো হয়। গোয়ার্তুমিও যায় বেড়ে।

কিছুতেই যখন বন্ধুদের সে রুখতে পারল না, অগত্যা সে বলল, বেশ, তোমরা যখন হাতে ধরে মৃত্যু ডেকে আনবে তবে একটু সবুর করো, আমি গাছে চড়ে নিই, তারপরে মন্ত্র পড়ো।

এই বলে বিষণ্ন মুখে শেষবারের মতো ওদের সাবধান করতে করতে একটা গাছে চড়ে বসল।

অশেষবিদ্য তখন চোখ বুঝে মন্ত্র পড়তে লাগল। সিংহের শরীরটা আগেই তৈরি হয়ে আছে। এবার মন্ত্রের প্রভাবে প্রথমে কেশরগুলো কেঁপে উঠল, তারপর শরীরটা নড়ে উঠল। তারপর! চোখ খুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। মৃত সিংহ জীবন ফিরে পেল ওদের চোখের সামনে।

মন্ত্রপড়া শেষ করে অশেষবিদ্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখারও সুযোগ পেল না। প্রচণ্ড গর্জনে চোখের পলকে অনেক দিনের ক্ষুধার্ত পশুরাজ লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। আর সামনে দাঁড়ানো হতবুদ্ধি দু' জনকে দুই থাবায় শেষ করে দিল।

জীবন ফিরে পাওয়া ক্ষুধার্ত পশুরাজের হাতে একে একে তিন পণ্ডিত বন্ধু প্রাণ হারাল। ভোজ শুরু করল পশুরাজ।

বিষণ্ন সুবুদ্ধি রাতটা গাছের সঙ্গে গামছা দিয়ে কোমর বেঁধে কাটাল। সকাল হলে সিংহ চলে গেলে সে গাছ থেকে নেমে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

চার পণ্ডিতমূর্খ

বিস্তর লেখাপড়া শেষ করেছে; কিন্তু চলাফেরায় ও কাজে বিদ্যার ছাপ একটুও নেই। এরকম বিদ্বানরাই হল পণ্ডিতমূর্খ। এরকম বিদ্যাদিগ্‌গজ চার বামুন যুবক। তারা আবার বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। খেলেছে-দেলেছে। বিস্তর পড়াশুনো করেছে। কিন্তু কোনো বিষয়ই গভীরভাবে শেখে নি। আসল শিক্ষা নিতে পারে নি।

সে সময় দক্ষিণ ভারতের-কান্যকুব্জের পণ্ডিতদের খুব নামডাক ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে তাদের কাছে লিখতে আসত ছাত্ররা। সেখানে গিয়ে গুরুর বিদ্যামঠে থেকে নানা শাস্ত্রের শিক্ষা নিত। তা এই চার বন্ধুও গেল সেখানে। গুরুমশায়ের কাছে লেখাপড়া শিখতে।

একনাগাড়ে তারা বারো বছর পড়াশুনো করে। এক মনে শিখে তারা চারজনে বলাবলি করছে, সব বিদ্যাই এখন আমাদের শেখা হয়েছে। এবার চলো, গুরুমশায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাই।

তাই হল। পরদিন চার বন্ধু গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

যেতে যেতে কিছু দূর গিয়ে দেখে পথটা দু' দিকে ভাগ হয়ে গেছে। এখন কোন পথে তারা যাবে কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না।

একজন বলল, তাই তো, বড় সমস্যা। কোন পথে গেলে ভালো হয় বলো তো?

হয়েছে কী, পাশের গ্রামে মারা গেছে এক বণিকের ছেলে। তার মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। বহু লোক, বহু মানুষ।

চার পণ্ডিতের এক পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি খুলে বসল। বলল, এই তো পাওয়া গেল; দেখো দেখো লেখা রয়েছে, মহাজন যে পথে যায় সেই হল পথ। তার মানে মহাজন হল বহু লোক। তাহলে আমরা আর দাঁড়িয়ে থাকি কেন?

বহু লোক যে-পথ ধরে যাচ্ছে সে পথেই চলো। আসলে মহাজন অর্থ মহৎজন, মহৎজন সে পথে চলেন সেই পথই হল আসল পথ, সাধারণ মানুষের সে পথ অনুসরণ করা উচিত। অর্থাৎ সৎ পথে চলার কথা বলেছে পুঁথিতে। পণ্ডিতমূর্খ বুঝল তার মতো। উল্টোটা।

তখন তারা চলল শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে। যেতে যেতে তারা দেখে এক গাধা ঘাস খাচ্ছে। অমনি দ্বিতীয় পণ্ডিত পুঁথি খুলে দেখল লেখা আছে, উৎসবে, আনন্দের সময়, দুর্ভিক্ষের কালে, শত্রুর আক্রমণ হলে, রাজদরবারে এবং শ্মশানে যে থাকে সেই হল বন্ধু।

সে তখন বন্ধুদের বলল, এই তো আমাদের বন্ধু। শ্মশানে চরে বেড়াচ্ছে।

এবারও তারা প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে নি। বুঝতে না পেরে বলল, তাই তো তাই তো! এই বলে তারা কেউ গাধার গলায় জড়ায়, কেউ পা ধোয়ায়, কেউ ঘাস তুলে দেয় তার মুখের কাছে, আরেকজন তার প্রশংসা করে। চার পণ্ডিতের পাল্লায় পড়ে গাধা তো ভয়ে-ময়ে তিড়িং বিড়িং লাফ জুড়ে দেয়। তার জীবন অতিষ্ঠ পণ্ডিতদের খপ্পরে পড়ে।

এমন সময় দেখা দিল এক উট। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হেঁটে চলেছে। তাকে দেখে পণ্ডিতেরা বলে উঠল, আরে আরে, এ আবার কে? একে তো কোনো দিন দেখি নি। দেখছ কেমন লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত চলছে?

তখন তৃতীয় পণ্ডিত পুঁথি খুলে বসল। দেখে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, ধর্মের গতি ত্বরিত। এবারও তারা ভুল বুঝল। বুঝল, ধর্ম চলে তাড়াতাড়ি। তাহলে এই তো প্রাণীর ধর্ম। আসলে সঠিক অর্থ হল, ধর্মকাজ করতে হয় তৎক্ষণাৎ।

চতুর্থ পণ্ডিতও পুঁথি ওল্টাচ্ছিল। সে বলে উঠল, এই তো পেয়েছি। দেখো দেখো, লেখা রয়েছে, ইষ্টকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করবে। এবারও তারা ভুল অর্থ করল। কথাটার আসল অর্থ হল, প্রিয় কাজ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করবে, অর্থাৎ প্রিয় বস্তু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করবে।

চতুর্থ পণ্ডিত তখন শাস্ত্রের কথা বন্ধুদের বুঝিয়ে বলল, তাহলে ইষ্ট অর্থ হল আত্মীয় বা বন্ধু। বন্ধুকে তাহলে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হয়। চলো তাই করি।

গাধাকে তারা শ্মশানে পেয়েছে, তাই বন্ধু। চারজনে তাই ছুটে গিয়ে গাধাকে জাপটে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে উটের গলার দড়ির সঙ্গে বেঁধে দিল।

লম্বা গলা উটের টানে গাধার প্রাণ যায় যায়। সে পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল। গাধার মালিক ধোপা কাছেই কোথাও ছিল। গাধার চিৎকার শুনে সে ছুটে এল লাঠি নিয়ে।

চার পণ্ডিত ধোপাকে লাঠি হাতে মারমুখো দেখে ভয়ে দিল দৌড়। তাদের সেই দৌড় থামল এক নদীর তীরে এসে। পেছনে তাকিয়ে ধোপাকে দেখতে না পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হল। তখন তারা হাত-মুখ ধুতে নামল নদীতে। একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরিয়ে নিয়ে তবে নদী পার হবে। ঠিক করল। এরি মধ্যে অনেক ধকল গেছে। বিদ্যাও কম খরচ হয় নি। জিরানো দরকার।

নদীতে ভেসে আসছিল একটা পশালপাতা। তাই দেখে এক পণ্ডিত পুঁথির পাতা ওল্টাতে লাগল ঝাটিতি। এক জায়গায় দেখল, যে পত্র আসবে সেই আমাদের পার করে দেবে। এবারও পণ্ডিতটা ভুল করল। এখানে পত্র অর্থ নৌকো, সে সঠিক অর্থ বুঝতে পারল না।

তারপর পাতাটা স্রোতে ভেসে কাছাকাছি এলে সে বলল, এই তো পত্র কাছে এসেছে, আর দেরি করি কেন?—বলেই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পাতার উপরে, পড়েই স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল।

বন্ধুকে ভেসে যেতে দেখে অন্য এক পণ্ডিত তাড়াতাড়ি তার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলে উঠল, সব যখন যেতে বসবে পণ্ডিত ব্যক্তি তখন আধা ছেড়ে দেয়, বাকি আধা নিয়ে তুষ্ট থাকে। তাহলে বন্ধুর সবটা কেন আমি হারাই। অর্ধেক তো রেখে দেব।—এই বলে সে চোখের পলকে কোমর থেকে ছুরি বের করে ঘচাং করে বন্ধুর গলা কেটে ফেলল।

তার মুণ্ডটা হাতে ধরা রইল, শরীরটা স্রোতে ভেসে চলল।

ছিল চারজন, এবার হল তিনজন। তারা পত্র হারিয়ে নদী পার না হয়ে উল্টো মুখে রওনা দিল। যেতে যেতে তারা পৌঁছে গেল এক গ্রামে। পুঁথিপত্র বগলদাবা তিন পণ্ডিতকে দেখে গ্রামের লোক তাদের খুব খাতির করল। তারপর নিমন্ত্রণ করে একেকজনকে একেকজনের বাড়িতে নিয়ে গেল।

নিয়ে এক বাড়িতে একজনকে খেতে দিল ঘি-চিনি-দুধ মেশানো সেমাই। তা দেখে নেড়েচেড়ে ভেবে-চিন্তে পণ্ডিত বলল, এতো দেখছি লম্বা লম্বা সুতোর মালা। পুঁথিতে দেখেছি দীর্ঘসূত্রী মরে। এবারও যথারীতি সে অর্থ বুঝতে ভুল করল। আসলে দীর্ঘসূত্রী অর্থ অলস, যে সঠিক কাজ সঠিক সময়ে করতে দেরি করে। সে উল্টো বুঝে বলল, সর্বনাশ, এ খেলে তো নির্ঘাৎ মৃত্যু। বাপ রে!

সে তক্ষুণি খাওয়া ফেলে চলে গেল। এক দৌড়।

ওদিকে দ্বিতীয়জনকে দ্বিতীয় বাড়িতে খেতে দিয়েছে আটার তৈরি পাতলা মণ্ড। তা দেখে তারও মনে পড়ল পুঁথির কথা—বড় বেশি যা ছড়ানো তা কখনো আয়ু বাড়ায় না। এবারও সে স্বাভাবিকভাবে আসল কথার ভুল ব্যাখ্যা করল। ছড়ানো-ছিটানো বা অবহেলার জীবন দীর্ঘ হয় না। অল্পেই তাদের শেষ হয়।

অমনি তার খাওয়া মাথায় উঠল। পাত থেকে উঠে পুঁথিপত্র নিয়ে দে দৌড়।

তৃতীয় পণ্ডিতকে তৃতীয়জনের বাড়িতে খেতে দিল চাল ও মাষকলাইয়ের গুঁড়ো দিয়ে বানানো পিঠে। তার গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ফুটো। এভাবেই তৈরি হয় এই পিঠে। খেতেও খুব ভালো।

দেখে তো পণ্ডিতের চোখ কপালে উঠল। সে পুঁথিতে পড়েছে, অনেক ছিদ্র যার বিপদ বাড়ে তার। সে তো পণ্ডিতমূর্খ। সে বুঝল উল্টো। আসল অর্থ হল যার চরিত্রে অনেক ছিদ্র বা দুর্বলতা আছে তার পদে পদে বিপদ।

বিপদে পড়ায় ভয়ে সে অমনি উঠে চলে গেল। পিঠে খাওয়া উঠল পিঠে।

এভাবে তিন পণ্ডিতমূর্খ গাঁসুদ্ধ লোক হাসিয়ে, পেটে দাউদাউ খিদের আগুন নিয়ে পথে নামল। অনেক কষ্টে ফিরল দেশে। একজনকে হারিয়ে তারা ফিরতে পারল।

পঞ্চতন্ত্রের বচন

১. মহৎ জনের বুদ্ধি ও সুপরামর্শ যার সহায় সে অসাধ্য সাধন করতে পারে।

২. শত্রু সামান্য সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ধ্বংসের কারণ হয়, যেমন ছোট্ট ফুটো দিয়ে পানি ঢুকে আস্তে আস্তে নৌকো ডুবিয়ে দেয়।

৩. যে কাউকে বিশ্বাস করে না সে দুর্বল হলেও প্রবল বলবানেরা তার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তারা বলবান হলেও দুর্বলের হাতে ধ্বংস হয়।

৪. একবার যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাকে আবার বিশ্বাস করলেও ধ্বংস অনিবার্য।

৫. আক্রমণ করার আগে ভেড়া পিছু হটে যায়, লাফ দেওয়ার আগে সিংহ শরীর গুটিয়ে ছোট হয়ে যায়। তেমনি বুদ্ধিমানেরা সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য করে গোপনে নিজের কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করে।

৬. অসাবধানী, নিষ্ঠুর, ভীরু, লোভী, অলস, মূঢ়, অস্থির এবং যে হিতাকাঙ্ক্ষীদের অবজ্ঞা করে, অসৎ—এমন শত্রুকে সহজেই বিনাশ করা যায়।

৭. সুসময়ে বন্ধুত্ব করতে আসে দুর্জন ও খল। বিপদে যে বন্ধু হয় সেই প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর বিত্ত-সম্পদ বাড়তে দেখলেও কখনো অখুশি হয় না।

৮. নিজের ও অপরের যা কল্যাণকর তাই পুণ্য, তাই ধর্ম। নিজের ও অপরের যা কল্যাণকর নয় তাই পাপ, তাই অধর্ম। সব কাজ করতে হয় ধীরে-সুস্থে। কিন্তু ধর্মকাজ ও পুণ্যকাজ সব বাধা ডিঙিয়ে তাড়াতাড়ি করতে হয়।

৯. রাজার যে মঙ্গল করে লোকে তাকে বিষনজরে দেখে। দেশের ও দশের যে মঙ্গল করে রাজা তাকে ত্যাগ করে। এই উভয় সঙ্কটের ক্ষেত্রে এমন লোক মেলা ভার যে একই সঙ্গে রাজার এবং দেশের কাজ করতে পারে।

১০. শত্রু যদি দুষ্ট ও বলবান হয়, তার সঙ্গে মনে এক মুখে অন্য এমন ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। থাকতে হয় অবিশ্বাসে অবিশ্বাসে, সামনে মিত্রতা পিছনে শত্রুতা—এই নীতি মেনে চলতে হয়।

১১. বিশ্বাসের অযোগ্যকে বিশ্বাস করতে নেই, যে বিশ্বস্ত তাকেও বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস থেকেই ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়, এবং তার থেকেই আসে বিনাশ।

গর্দভ-সঙ্গীত

এক

গাধা। তার একটা নাম ছিল। উদ্ধত। সারা দিন সে ধোপার কাপড় টানত। পিঠে যত বইত তত খাবার জুটত না। তাই রাতের বেলায় ধোপার বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপি চুপি বেরিয়ে চাষীদের ক্ষেতে গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিত। তারপর রাত থাকতে ঘরে এসে শুয়ে পড়ত।

এভাবে ভালোমন্দ খেয়ে তার দিন ভালোই কাটছিল। গায়ে-গতরে মোটাও হতে লাগল। রাতে এরকম চলাফেরার সময় এক শেয়ালের সঙ্গেও খুব ভাব হল। তারপর থেকে গাধার রাতের সঙ্গী হল শেয়াল।

মোটাসোটা গাধা তখন সহজেই চাষীদের ক্ষেতে বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়তে পারত। শসাক্ষেতে ঢোকা তার জন্য কিছুই না। শেয়ালও তার পিছু পিছু ঢুকে ইচ্ছেমতো শসা খেয়ে নিত। এমনি করে পরম সুখে চলছিল দুই বন্ধু গাধাও শেয়ালের রাত।

শরতের এক চাঁদনি রাতে তারা ঢুকে পড়ল শসা ক্ষেতে। ঝকঝকে রাত, আকাশে মেঘের কণামাত্র নেই। জ্যোৎস্নার বাঁধ ভাঙা বন্যা। দু' জনে কচি কচি শসা বেছে বেছে খেতে লাগল।

শরতের জ্যোৎস্না দেখে গাধার পেল গানের নেশা। কিছুতেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। তখন সে শেয়ালকে বলল, ভাগনে, আজকের রাতটা কী সুন্দর দেখেছ? আমি বাপু এমন রাতে গান না গেয়ে আর পারছি না। ওসব শসা-টসা এখন রাখো। গান করি শোনো। কোন রাগ গাইব বলো তো?

শেয়াল আঁতকে উঠে বলল, দোহাই মামা, রক্ষে করো। শুধু শুধু কেন বিপদ ডেকে আনা। জানো তো, লোকে বলে চুরি করতে গিয়ে গান আর হাঁচি বড় খারাপ জিনিস। তাছাড়া তোমার গলাটাও তো খুব মধুর নয়। শাঁখ আর হাঁড়ির মতো আওয়াজ। বহু দূর থেকে শোনা যায়। এখন ক্ষেতের পাহারাদার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভাগনে, আজকের রাতটা কী সুন্দর দেখেছ? আমি বাপু এমন রাতে গান না গেয়ে পারছি না।

আমার গান শুনে তাদের ঘুম আরো গাঢ় হবে।

না মামা, বরং তোমার গানের গুঁতোয় জেগে উঠবে। তখন রেগে-মেগে লাঠি নিয়ে আসবে। কাজ কী ওসব কেলেঙ্কারি করে। মন দিয়ে শসা খাও, পেট ভরলে পালাও। তাহা অমৃতের মতো স্বাদ। শসা তো নয় যেন রসগোল্লা।

ভাগনের কথা শুনে গাধা মামা গেল রেগে। বলল, হুঁ, জংলী তো। বন-জঙ্গলে তো থাকো সঙ্গীতের কী বুঝবে! গানের রসের চেয়ে তোমার চোখ খাদ্য রসের দিকে। আমি বরাবর এটা লক্ষ করে আসছি। ভাগনে রে, এমন বেরসিক জানলে তোমাকে সঙ্গেই আনতাম না। এত দিন আমার সঙ্গে থেকেও কোনো উন্নতি হল না। নাও, শোনো!

পাছে অমনি শুরু করে বসে তাই শেয়াল তাড়াতাড়ি বলল, মামা, বেরসিক আমি নই। এমন চাঁদের রাত সবসময় আসে না তাও বুঝি। তবে কি না তুমি তো গাও না, খালি চেঁচাও। তাই বলছি, ওসব গান-ফান এখন রাখো। তাতে তোমারই বেশি বিপদ।

শুনে গাধা গেল আরো খেপে। বলল, বলে কী রে মুখ্যুটা? আমি গান জানি না! শোনো ভাগনে, সাতটি স্বর, তিন গ্রাম, একুশ রকম মূর্ছনা, আর ঊনপঞ্চাশ তাল–এই হল গিয়ে সুর। সাত সুরের 'গা' সুরটির নাম গান্ধার, ওটা আমার ডাক

থেকে নেওয়া। তারপর আছে তিন মাত্রা, তিন লয়, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, নয় রস আর ভাব চল্লিশ। এসব আমার ঠোঁটের আগায়, কণ্ঠস্থ। এই ধরছি, তুমি কোনো মতে তাল ঠুকে যাও, শোনো তাহলে—

মুখের আর একটি কচি শসা গিলে তড়াক করে লাফ দিয়ে শেয়াল বলল, মামা, একটু সবুর। আমি আগে বেড়ার বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। চাষী বেটা এলে তোমাকে বলে দিতে পারব। তারপর তুমি তেড়েফুঁড়ে গান ধরো। চাঁদনি রাতটাও জমুক। তোমার যখন ইচ্ছে।

তাই হল। শেয়াল ক্ষেত থেকে বেরিয়ে ঝোপে গা ঢাকা দিল মজা দেখার জন্য। আর গাধা মনের আনন্দে আকাশের দিকে মুখ করে গলা ছেড়ে ধরল গান। দিল এক টান।

তার বিকট হ্যাঁক্‌কো হ্যাঁক্‌কো শুনে চাষীদের ঘুমের দফারফা। তারা রেগে-মেগে লাঠিসোঁটা নিয়ে এল দল বেঁধে। ঘিরে ফেলল ক্ষেত। আর গাধাকে পেয়ে দিল বেধড়ক পিটুনি। পিটুনি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আধ মরা হয়ে বুজল চোখ। ব্যথাটা সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল।

ক্ষেতের পাশেই ছিল পানি সেঁচার জন্য তাল গাছের দোন। চাষীরা সেটা গাধার গলার সঙ্গে কষে বেঁধে দিল যাতে পালাতে না পারে। তারপর তারা আবার ঘুমোতে চলে গেল।

একটু পরে কোথায় ব্যথা, কোথায় কী। গাধা উঠে দাঁড়াল। আসলে কুকুর, গরু, ঘোড়া ও গাধা পিটুনি খেয়েও ভুলতে তাদের সময় লাগে না। উঠে গাধা অনেক চেষ্টা করল দোনটা ঝেড়ে ফেলবার। পারল না। শেষে দোনটা নিয়েই বেড়া ভেঙে টানতে টানতে চলল।

এবার শেয়াল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। সামনে এসে মুচকি হেসে বলল, বাঃ বাঃ মামা, গান গেয়ে বেড়ে মেডেল বাগিয়েছ। ভাগনের কথা তো শুনলে না, এবার গানের পুরস্কার নিয়ে ঘরে যাও, কর্তাকে দেখাও গে।

তাঁতি মন্থর

মন্থর নামে এক তাঁতি ছিল। সে ছিল খুব গরিব। কিন্তু ভারি ভালো মানুষ। বউকে খুব ভালোবাসত। বউকে সুখী করার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করত। পরিশ্রম করলে হবে কী! বেচারি হাত চালিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারত না। তাই তার অভাবও ঘুচত না।

কপালটাও মন্দ। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো একদিন কাপড় বুনতে বুনতে তাঁতের সব কাঠ ভেঙে গেল। তখন সে কাঠ জোগাড় করতে কুড়োলটা নিয়ে গেল বনে। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পেল একটা ভালো শিশু গাছ। গাছটাও ছিল বিরাট। সেটা কাটতে পারলেই তার তাঁতের কাঠ তো হবেই, বাড়ির অন্যান্য কাজেও লাগবে।

মন্থর তখন কোমরে গামছা বেঁধে কুড়ুল উঁচিয়ে কোপ মারতে গেল। এখন সেই গাছে থাকত এক যক্ষ। মন্থরকে কুড়ুল তুলতে দেখে সে গাছ থেকে বলে উঠল, ওহে মন্থর থামো, এ গাছ কেটো না।

মন্থর কুড়ুল নামিয়ে গাছের দিকে তাকাল। দেখে কেউ কোথাও নেই। কিন্তু সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে মানুষের গলা। তখন সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, তুমি কে, কোথা থেকে বলছ? বেরিয়ে এসে বলো।

গাছের ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় যক্ষ বলল, আমি এক যক্ষ। এই গাছে অনেক দিন থেকে আমি থাকি। আমার ঘর। এখানে আমি মহা সুখে আছি। সমুদ্রের চমৎকার হাওয়া খাই। গা জুড়িয়ে যায়।

মন্থর বলল, গাছ না কাটলে তো আমার চলবে না। আমার তাঁত গেছে ভেঙে। তাঁত ঠিক করতে না পারলে আমার বউ-ছেলে-মেয়ে খাবে কী! ওসব হবে-টবে না। তুমি চটপট অন্য কোথাও চলে যাও। আমি এটা কাটব।—বলেই সে আবার কুড়ুল তুলল।

যক্ষ তখন ব্যস্ত হয়ে বলল, দোহাই তোমার। এ গাছ কেটো না। তার বদলে

তুমি কী চাও বলো। তোমার পছন্দমতো যা চাও আমি দেব। গাছটা কেটো না দয়া করে। বলো, কী চাই তোমার?

মন্থর এবার খুশি হল, মুখে হাসি ফুটল। সে কুড়ুল নামিয়ে রেখে বলল, এটা বেশ ভালো কথা বলেছ। তা অনেক কিছুই তো চাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কোনটা চাওয়া ঠিক হবে বুঝতে পারছি না। তুমি এমনভাবে বলছ যে শুনেই আমার তালগোল পেকে যাচ্ছে। তুমি বাপু একটু সবুর করো। আমি বাড়িতে গিয়ে বন্ধু আর বউকে জিজ্ঞেস করে আসি। আমার বউয়ের আবার বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু বেশি। আমার মাথায় অত-শত আসে না। বাড়ি থেকে আসি, তারপর তুমি দিও।

যক্ষ বলল, বেশ তাই হবে।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাঁতি ছুটল বাড়িতে। গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল অনেক দিনের বন্ধু নাপিতের সঙ্গে। তার বুদ্ধি-শুদ্ধি অনেক, এজন্য তাঁতি তাকে খুব আপন ভাবে।

তাঁতি হাসতে হাসতে বলল, তোমার কাছেই যাব ভাবছিলাম। পথে দেখা হয়ে ভালোই হল। কথাটা এখানেই সেরে ফেলি। শোনো, এক যক্ষের কাছ থেকে কায়দা করে একটা বর বাগিয়েছি। কিন্তু কী চাইব তা বুঝতে পারছি না। কী চাওয়া যায় বলো তো?

নাপিত ছিল খুব বুদ্ধিমান। সে বলল, ভাই, তাহলে রাজ্য চাও। তুমি রাজা হবে, আর আমি হব তোমার মন্ত্রী। দু' জনে মিলে বেশ সুখে থাকা যাবে। আর তোমার বউও হবে রানী।

মন্থর বলল, তুমি ঠিক বলেছ। যাই বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। বউকেও জিজ্ঞেস করে দেখি সে কী বলে। হাজার হোক সে আমার বউ। তার উপর রানী হবে। যেমন-তেমন কথা নয়।

নাপিত বেজার মুখে বলল, বাড়িতে গিয়ে আর কাজ কী! সে-ও তো সুখে-শান্তিতে থাকতে চায়। তার কাছে আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে! ওর কাছে গেলে দেরি হয়ে যাবে। শুভ কাজ শীঘ্র করা ভালো।

মন্থর মুখ ভার করে বলল, না ভাই, সে হয় না। বউ আমাকে কত ভালোবাসে! তাকে জিজ্ঞেস না করে এত বড় কাজ করা ঠিক হবে না। আচ্ছা, চলি ভাই।

বলেই মন্থর বাড়ির দিকে ছুটল।

বউকে ডেকে বলল, বউ, ও-বউ, শোনো শোনো, এক যক্ষকে বাগিয়েছি; যা চাইব তাই দেবে। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। এবার বলো তো কী চাওয়া যায়? সেই যে আমার বন্ধু নাপিত, তার সঙ্গে পথে দেখা। সে বলল, রাজ্য চাও।

তাঁতি-বউ বলল, তোমার যেমন আক্কেল। নাপিতদের আবার বুদ্ধিশুদ্ধি কবে থেকে হল? রাজ্য চালানো কি চাট্টিখানি কথা? এক কাঁড়ি ঝঞ্ঝাট। নাওয়া-খাওয়ার সময় পাবে না। তাছাড়া কত খুন-খারাবি হয় শোনো নি? হাজার গণ্ডা প্রজা, তাদের

হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ে! তারপর যুদ্ধ-টুদ্ধ হলে তো হয়েছে। ওসব বেআক্কেলে বুদ্ধিতে কাজ নেই। অত ঝামেলার কী দরকার!

তাঁতি বলল, তা যা বলেছ। অত ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে কী কাজ! তাহলে কী চাই বলো তো?

বউ বলল, শোনো, তুমি তো এখন রোজ একটা করে তাঁত বোনো। তাতে আমাদের খরচাপাতি কোনো মতে কুলিয়ে যাচ্ছে। এখন তোমার দরকার পিঠের দিকে আরও দুটি হাত আর একটি মাথা। ওই মাথা আর বাড়তি দুটি হাত যক্ষের কাছে চেয়ে নাও। তাহলে সামনের হাত একটি কাপড় বুনলে পিছের দুটি হাতও একটি বুনবে। দিনে দু'খানা কাপড় হলে খাওয়া-পরা চলে টাকা জমবে। আমার গয়নাগাটি হবে। আমার কত দিনের সখ সোনার অলঙ্কার পরব। নাকে নথ, গলায় হার, কোমরে বিছা, পায়েও সোনার মল!

বউয়ের কথা শুনে মন্থর তো মহা খুশি। সে বলল, ঠিক বলেছ গিন্নি। তোমার কথাই ঠিক। রাজা হলে লোকে বলবে যে রাজ্য কোথায় পেয়েছ। যাই তাহলে, এক্ষুণি বরটা নিয়ে ফিরে আসছি।

যক্ষের কাছে গিয়ে তাঁতি বলল, ভাই যক্ষ, এবার আমার বর দাও। আমাকে আর এক জোড়া হাত ও একটা বাড়তি মাথা দাও। আমার পেছন দিকে।

যক্ষ বলল, বেশ তাই হোক।

বলতে বলতে মন্থরের হয়ে গেল দুটি মাথা, চারটি হাত। সে তখন পিছন দিয়েও দেখে, সামনে তো দেখেই। মহা খুশি মন্থর। এখন বাড়িতে গিয়ে দেখাতে পারলেই সুখ। এই বলে সে খুশিতে সামনের দু' হাতে দিল তালি। অমনি পিছনের হাত-দুটিও তালি মেরে বসল। কী মজা!

কিন্তু চলতে গিয়ে হল ঝামেলা। সামনে পেছনে দুটি করে চোখ, দুটি মাথা, কোন দিকে চলবে ঠিক করতে পারল না। শেষে পায়ের দিকে তাকিয়ে দিশা ঠিক করল। কারণ পা-তো দুটি, তাই আঙুল কোন দিকে আছে দেখে মিটমাট করে নিল।

বন থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই আরেক বিপদ। রাস্তার ধারে খেলছিল ছেলেরা। হঠাৎ সামনে তাঁতির কিম্ভূত চেহারা দেখে ওরা ভিরমি খাবার জোগাড়। তারা ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল, ভূত, ভূত, ভূত! রাক্ষস, রাক্ষস, রাক্ষস!

কয়েকটা সাহসী ছেলে দাঁড়িয়ে ঢিল মারত শুরু করল। ওদের চিৎকার শুনে ঘর থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে বড়রা বেরিয়ে এল। মন্থরকে দেখে তারা ভাবল রাক্ষস। রাক্ষস মন্থরের ছদ্মবেশে এসেছে ছেলেদের খেতে।

তাদের চিৎকারে আরো লোকজন চলে এল। ঘটনার আকস্মিকতায় মন্থর আরো মন্থর হয়ে গেল। তার মুখে কোনো কথা ফুটল না। ব্যস, সকলে মিলে মন্থরকে পিটিয়ে গুঁতিয়ে শেষ করে ফেলল। মন্থর চিরকালের জন্য থেমে গেল।

রাজকন্যা, রাক্ষস ও চোর

এক দেশে ভদ্রসুর নামে এক রাজা ছিল। তার ছিল পরমাসুন্দরী এক কন্যা। এক রাক্ষসের নজর পড়ল তার উপর। সে রাজকন্যাকে চুরি করার মতলব নিয়ে প্রতি রাতে একবার করে রাজবাড়িতে হানা দিত।

রাজকন্যার মহলের বাইরে ছিল কড়া পাহারা। ভিতরে ছিল সখিদের কঠিন নজরদারি। তাই রাক্ষস সুবিধে করতে পারত না। সে করত কী অদৃশ্য হয়ে রাজকন্যার মহলে ঢুকে বিকেল থেকে রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ঘাড়ে চেপে থাকত। সে সময় অমন রূপসী রাজকন্যার চোখ-মুখ হয়ে যেত ভয়ঙ্কর। যাকে সামনে পেত আঁচড়ে-কামড়ে জখম করে দিত। আর আবোল-তাবোল বকত।

এভাবে চলছিল দিনের পর দিন। একদিন হল কী, রাক্ষসটা মাঝরাতে রাজকন্যার ঘাড়ে না চেপে কী ভেবে ঘরের কোণে লুকিয়ে রইল। রাজকন্যার সখিরা জেগেই ছিল। রাজকন্যাও। একথা সে কথার পর এক সময় রাজকন্যা এক সখিকে বলল, দেখো সখি, বিকেলে রাক্ষসটা আমার উপর অত্যাচার করে। কী করলে শয়তানটাকে শায়েস্তা করা যায় বলো তো?

একথা শুনে রাক্ষসটা ভয় পেয়ে ভাবতে লাগল, তাই তো, বিকেল নামে অন্য একটা রাক্ষসও দেখছি প্রতি রাতে রাজকন্যাকে চুরি করতে আসে। তাকে একবার দেখতে হয়! এক কাজ করি ঘোড়া সেজে ঘোড়াশালে লুকিয়ে থাকি। সেখান থেকে দেখব সে বেটার কেমন চেহারা, আর কেমন ক্ষমতা।

এই ভেবে সে ঘোড়া সেজে ঘোড়াশালে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে গভীর রাতে প্রহরীরা যখন ঘুমোচ্ছে সে সময় এক ঘোড়া-চোর ঢুকল ঘোড়াশালে। বেছে-বুছে যে ঘোড়াটা তার পছন্দ হল, সেই ঘোড়া ছিল রাক্ষসটা।

চোর রাক্ষসের মুখে লাগাম লাগিয়ে লাফ দিয়ে চেপে বসল পিঠে। আর রাক্ষস ভাবল, নিশ্চয়ই এই বেটাই বিকেল। আমাকে চিনতে পেরে মেরে ফেলতে এসেছে। হায় হায়, এখন আমি কী করি।

অমনি সুযোগ বুঝে চোর একটা ডাল ধরে টুক করে ঝুলে পড়ল।

ততক্ষণে চোর ঘোড়ার লাগাম ধরে পিঠে লাগাল সপাং সপাং ঘা। ভয় পেয়ে রাক্ষস এক দৌড়ে রাজবাড়ির ফটক পার হয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল।

অনেক দূরে গিয়ে চোর লাগাম টেনে ঘোড়া থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাক্ষস-ঘোড়া কী আর থামে? চোর তখন ভাবল, ঘোড়া তো কখনো এমন হয় না সে লাগাম মানবে না? এতো মনে হচ্ছে ঘোড়া নয়। নিশ্চয়ই কোনো রাক্ষসাল। ঘোড়া সেজে ঘোড়াশালে ঢুকেছিল কোনো বদ উদ্দেশ্যে। সর্বনাশ! একটা সুবিধেমতো জায়গায় লাফিয়ে পড়তে না পারলে তো বাঁচোয়া নেই।

চোর এসব ভাবছে আর রাক্ষস ছুটছে প্রাণের ভয়ে। রাক্ষস বুঝতে পারছে না তার পিঠে কে চেপেছে।

আবার চোরও ভাবছে, এ ঘোড়া রাক্ষস না হয়ে যায় না। এর মতিগতি বোঝা মুশকিল। এমন ঘোড়া সে আর কখনো দেখে নি।

ছুটতে ছুটতে ঘোড়া এক ঝাঁকড়া বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছে। অমনি সুযোগ বুঝে চোর একটা ডাল ধরে টুক করে ঝুলে পড়ল। তারপর একটা মোটা ডালে বসে হাঁফাতে লাগল।

এভাবে চোর ও রাক্ষস দু' জনে দু' জন থেকে আলাদা হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তখন সেই বটগাছে থাকত রাক্ষসটার এক বন্ধু বানর। সে রাক্ষস ঘোড়াকে ভয়ে ছুটতে দেখে চিৎকার করে ডাক দিল, কী হল, পালাচ্ছ যে, কী হয়েছে তোমার?

বন্ধু বানরকে দেখে ভরসা পেয়ে রাক্ষস দৌড় বন্ধ করে থমকে দাঁড়াল। বলল, ওরে বাপরে, বিকেল চেপে বসেছিল পিছে। আর একটু হলেই গেছিলাম। এই মাত্র তার হাত থেকে রেহাই পেলাম।

বানর হেসে বলল, বিকেল-টিকেল আবার কি? ও-তো একটা মানুষ।

বানরের কথা শুনে রাক্ষস তখন নিজের সম্পূর্ণ রূপ ধরল। কিন্তু ভয় কমল না। দুরু দুরু বুকে একবার গাছতলায় দু' পা এগিয়ে যায়, আবার দু' পা পিছিয়ে গিয়ে তাকায়।

বানর রাক্ষস বন্ধুকে চিনতে পেরে বলল, সে কী বন্ধু, তোমার পিঠে চেপেছিল একটা মানুষ। তোমার খাদ্য। খেয়ে নাও।

রাক্ষস দেখে চোরের তো হয়ে গেছে। বানরটা রাক্ষসকে ডেকে এনেছে। দেখে ভয়ে ও রাগে করল কী, মাথার উপর ঝুলে পড়া বানরের লেজটা ভয়ে মুখে পুরে চিবুতে লাগল। সে মনে করেছিল ওটা বটের ঝুরি।

কাণ্ড দেখে বানরের আত্মা খাঁচাছাড়া। সে ভাবল লেজ চিবিয়ে যে খায়, সে তো মানুষ হতে পারে না। এ যে রাক্ষসের বাড়া, বিকেল-টিকেল আবার কী! ভয়ে বানরের কথা বন্ধ। সে চোখ-মুখ খিঁচিয়ে পা চেপে বসে রইল। আর থরথর কাঁপছে। কী করে পালাবে ভাবছে।

রাক্ষস তখন বানরের সেই অবস্থা দেখে বলে উঠল, বন্ধু, এই বেলা আমি পালাই। দেখেই বুঝতে পারছি তোমাকে বিকেলে ধরেছে। বলেই দিল পিঠটান। আর সেই রাজ্যে সে কখনো আসে নি।

রাজকন্যাও বাঁচল রাক্ষসের হাত থেকে।

দু' মুখো ভারণ্ড

এক সরোবরের তীরে ভারণ্ড নামে এক অদ্ভুত পাখি থাকত। তার ছিল একটি পেট, দুটি পা, আর দুটি মাথা।

একদিন খাবার খুঁজতে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে গেল। সেখানে বালির উপর পড়েছিল লাল টুকটুকে এক ফল। দেখে ভারণ্ডের একটা মাথা খানিকটা মুখে দিল। দিয়েই তো উঠল চমকে। ওরে ব্বাস! কী দারুণ খেতে! এরকম কোনো দিন কোনো কিছু সে জীবনে খায় নি।

আরো ঠুকরে খানিকটা করে ফল মুখে দেয় আর আপন মনে বলে, আহা, এমন সুস্বাদু ফল জীবনে খাই নি। এ যে অমৃত। নিশ্চয়ই দেবতারা খাওয়ার সময় পড়ে গেছে। আহা, আরো দু'-একটা যদি পেতাম!

এসব শুনে ভারণ্ডের দ্বিতীয় মুখটা বলে উঠল, ভাই; অমন অমৃত ফলটার সবটুকু একা খেয়ে শেষ করিস না। আমাকে একটু দে। জিভের সুখটা করি।

শুনে প্রথম মুখটা হেসে বলল, অমন ছটফট করছিস কেন? পেট তো একটাই। শেষ পর্যন্ত ফলের রস তো সেখানেই যাবে। আলাদা খেয়ে আর কী লাভ? সামান্যই আর আছে। বাড়িতে গিয়ে এটুকু বউকে দেব।

একথা শুনে ভারণ্ড পাখির দ্বিতীয় মুখটার ভারি অপমান হল। সে দিন থেকে সে মনমরা হয়ে রইল। কী করা যায় ভাবতে লাগল।

আর একদিন ভারণ্ড খাবার খুঁজতে বনে ঢুকেছে। সামনে পেল একটা বিষফল। অমনি দ্বিতীয় মুখটা গলা বাড়িয়ে সেটা খেতে গেল।

প্রথম মুখটা তক্ষুণি হা হা করে উঠে বলল, সর্বনাশ, করছিস কী মূর্খ! ও যে বিষফল, ওটা খেলে দু'জনেরই নির্ঘাত মরণ। খবরদার, মুখে নিস না।

দ্বিতীয় মুখটা হাসতে হাসতে বলল, সে দিন অমৃত ফল খাবার সময় তো আমার কথা মনে ছিল না। আবার আমাকে অপমানও করলি। আজ সেই অপমানের শোধ তুলব বিষফল খেয়ে। দেখি তুই কেমন করে বাঁচিস।

এই বলে সে টুক করে মুখে তুলে বিষফলটা গিলে ফেলল। আর কী, বিষের তেজে মারা পড়ল দু' মুখো ভারণ্ড।

পঞ্চতন্ত্রের বচন

১. অস্ত্রের আঘাতে শত্রু মরে। কখনো কখনো মরেও না। কিন্তু প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের আঘাতে শত্রুর নিশ্চিত বিনাশ হয়। অস্ত্র শুধু শরীরকেই আঘাত করে। বংশ, যশ, ঐশ্বর্য সব ধ্বংস হয় প্রজ্ঞার আঘাতে।

২. যুদ্ধে একজনও যদি উৎসাহী ও ধীরস্থির হয় সমস্ত সৈন্যই উৎসাহ পায়। আর একজন রণে ভঙ্গ দিলেই সব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এজন্যই রাজা চায় মহাবল, বীর, ধীরস্থির, উৎসাহী যোদ্ধা এবং ভীরুকে বর্জন করে।

৩. মিষ্ট কথা, ভালো লাগা কথা বলার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু শুনতে মন্দ লাগে অথচ সে কথায় ফল হয় শুভ তেমন কথা বলার লোকের সবসময় অভাব। সেই অপ্রিয় হিতকর কথা ক'জনেই-বা শোনে? অপ্রিয় হিতকথা যে বলে তাকে বন্ধু বলে গণ্য করতে হয়।

৪. দুর্বল কখনো কখনো এক জোট হলে প্রবল শত্রুও তাদের দমন করতে পারে না। যেমন একত্রে অনেক লতা জড়াজড়ি করে থাকলে ঝড় তাদের উড়িয়ে নিতে পারে না। মাটির গভীরে শেকড় আছে এমন বিশাল গাছও যদি একা থাকে ঝড় তাকে উপড়ে বা ভেঙে ফেলতে পারে। কিন্তু অরণ্যের একত্রিত গাছদের ঝড়েও তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সংসারে একা যে বীরপুরুষ শত্রু তাকে সহজেই বিনাশ করে।

৫. গরু থেকে মানুষ ঠিক সময়ে দুধ দুয়েও নেয়, আবার পালনও করে। ফুল-ফলদায়ী লতায় যেমন লোকে পানি দেয় আর তার থেকে তা পেড়েও নেয়। প্রজাকেও ঠিক তেমনই করতে হয়।

৬. রাজার ক্ষতি কিছু দেখলে আদেশের অপেক্ষা না করে যে সেটি দূর করার চেষ্টা করে সেই হল প্রকৃত রাজভৃত্য।

৭. রাজা যখন মন্ত্রীকেই রাজকাজে মুরুব্বি করে বসে তখন মন্ত্রীর অহঙ্কার বাড়ে। অহঙ্কারের ফলে রাজার অধীনে চাকরিতে মন্ত্রীর বিরক্তি ধরে। বিরক্ত হলে তার মনে জাগে স্বাধীন হবার ইচ্ছা। স্বাধীন হবার ইচ্ছা থেকে সে রাজার প্রাণনাশ করার চেষ্টা করে।

মূল পঞ্চতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক অনেককাল আগে। পরে পহ্লবী ভাষায় এর ভাষ্য নতুন করে উদ্ভূত হয়েছিল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে। মূল রচয়িতার নাম জানা না গেলেও পরবর্তী রূপের প্রণেতা হিসেবে বিষ্ণুশর্মার উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের রূপটির নাম 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। আর বাংলায় এর নাম 'হিতোপদেশ'। সুকুমারমতি তিন দুষ্টু রাজপুত্রকে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই কাহিনীগুলো রচিত। মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধি-বিগ্রহ, লব্ধসম্পদ নাশ ও অপরীক্ষিতকারিত্ব—এই পাঁচটি প্রসঙ্গের প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও একই অভিন্ন কাঠামোর অন্তর্গত। প্রতিটি প্রসঙ্গে আছে অনেকগুলো ছোট ছোট গল্প, এগুলো আবার একটি প্রধান গল্পের সঙ্গে যুক্ত। দেশ, মানুষ, লোকাচার, পশু-পাখি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার কী হওয়া উচিত ও কী অনুচিত তা আছে পঞ্চতন্ত্রে। আর এসব কাহিনী শুনে তিন দুষ্টু রাজপুত্র মজে গেল গল্পে, নাওয়া-খাওয়া গেল ভুলে। তারপর গল্প শোনা ও পড়া শেষ করে তারা হয়ে উঠলো আচরণে নম্র, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বিদ্যায় পারদর্শী। জাতকের সঙ্গে বহু মিল থাকার পরও পঞ্চতন্ত্র আজও তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকহিত গল্প হিসেবে সমাদৃত। এর নীতিকথা, রহস্যময়তা ও হেঁয়ালি শত শত বছর ধরে মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনে আসছে, শোনার সেই আকর্ষণ ও প্রয়োজন আজও তার ফুরোয়নি।

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

সপ্তম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়